নানা চর্চ্চা

নানা চর্চ্চা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কমলা বুক্‌ ডিপো লিমিটেড্‌
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মুখপত্র

আমি যখন বছর পনের আগে "নানাকথা" নামে একটি প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশ করি, তখন কোন কোন সমালোচক তার এই দোষ ধরেছিলেন যে উক্ত গ্রন্থে নানাকথা আছে— কিন্তু সে সব কথার ভিতর কোন যোগাযোগ নেই। ফলে ক্রমান্বয়ে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় পাঠকের মন নাকি যুগপৎ শ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

এ গ্রন্থে যে সকল প্রবন্ধ একত্র করা হয়েছে, যদিচ সেগুলি নানা সময়ে নানা বিষয়ে লেখা, তবুও এগুলির ভিতর একটি যোগসূত্র আছে; এ সবগুলিই আমাদের দেশের বিষয় আলোচনা। এ একরকম ভারতবর্ষের হিষ্টরি জিওগ্রাফির বই। হিষ্টরি বলছি এই জন্য যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে যেমন এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে, তেমনি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলেও এক জাতীয় প্রবন্ধ আছে। কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ব্যক্তিকে অবলম্বন করে যে প্রবন্ধ লেখা হয়, তাকেই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলা যায়। আশা করি এ প্রবন্ধগুলি পাঠকদের মনে ভারতবর্ষের বিচিত্র অতীত এবং বর্ত্তমান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কৌতূহল উদ্রেক করবে।

••

২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত

সুহৃদবরেষু

এ গ্রন্থে যে প্রবন্ধগুলি পাশাপাশি ছাপাচ্ছি, তার অনেক-গুলি প্রবন্ধই আপনি আমাকে লিখ্‌তে না হোক্ প্রকাশ করতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাই এ প্রবন্ধ-সংগ্রহ আপনার হাতেই তুলে দিচ্ছি, এই ভরসায় যে আমার এই নানাচর্চ্চা আপনি অনধিকার চর্চ্চা বলে উপেক্ষা করবেন না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সূচীপত্র

নানা চর্চ্চা

ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি *

হে সমিতির কুমার ও কুমারীগণ—

তোমাদের সমিতির কর্ণধার ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির সঙ্গে তোমাদের দু-কথায় পরিচয় করিয়ে দেবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। জিওগ্রাফি বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত—সাহিত্যের নয়; আর এ কথা সবাই জানে যে, আমি সাহিত্যিক হলেও হতে পারি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নই। তবে যে আমি এ অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য উদ্যত হয়েছি, তার কারণ অনধিকারচর্চা করবার কু-অভ্যাস ও দুঃসাহস দুই আমার আছে।

কিন্তু প্রথমেই এক মুস্কিলে পড়েছি। সকল বিজ্ঞানের মত জিওগ্রাফিরও একটা বিশেষ পরিভাষা আছে। সে পরিভাষা মূলত ইংরাজি। এ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় যে পরিভাষা আছে, তা হয় সংস্কৃত নয় ইংরাজীর অনুবাদ। সে সব সংস্কৃত কথার অর্থ বুঝতে হলে, তাদের আবার মনে মনে ইংরাজী ভাষায় উল্টে অনুবাদ করে নিতে হয়। একটি উদাহরণ দিই। অন্তরীপ ও Cape, এ দুটি কথাই বাঙালীর কাছে সমান অপরিচিত। এ দুয়ের মধ্যে সম্ভবতঃ Cape

---

* একটি পারিবারিক সমিতিতে পঠিত।

শব্দটিই তোমরা স্কুলঘরে বেশিবার শুনেছ, অতএব তোমাদের কাছে বেশি পরিচিত। অপরপক্ষে "উত্তমাশা অন্তরীপ" বল্‌লে আমরা ভাব্‌তে বসে যাই, জিনিষটা কি? আর ততক্ষণ চিন্তার দায় থেকে অব্যাহতি পাইনে, যতক্ষণ না কেউ বলে দেয় যে, ও হচ্ছে Cape of Good Hope-এর বাঙলা নাম। আর শৃঙ্গ অন্তরীপ (Cape Horn) শুনলে ত আমরা অগাধ জলে পড়ি। আর সে জলে পড়লে আর উদ্ধার নেই, কারণ সে জল বরফ জল।

আমাদের পরিভাষার দশা যখন এরূপ মারাত্মক, তখন আমি যতদূর সম্ভব পরিভাষা পরিত্যাগ করে আমার কথা ভাষায় বলতে চেষ্টা করব। যেখানে অগত্যা পরিভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হব, সেখানে ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করব। এ প্রস্তাব শুনে, আমার হাতে বাঙলা ভাষার জাত মারা যাবে ভেবে তোমরা ভীত হয়ো না। ইংরাজী বিজ্ঞানের পরিভাষাও ইংরাজী নয়—গ্রীক্। আর গ্রীক্ সভ্যতার বয়েস আড়াই হাজার বৎসর। সুতরাং তার স্পর্শে আমাদের ভাষার আভিজাত্য একেবারে নষ্ট হবে না। ভারতবর্ষের সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক্ সভ্যতার আর কোনও বিষয়ে মিল না থাকুক, বয়েসে মিল আছে।

ভূমণ্ডল

প্রথমেই আমি তোমাদের কাছে পৃথিবী নামক গোলকটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব।

এ গোলকটি ক্ষিতি আর অপ্, মাটি আর জল এই দুই ভূতে গড়া। আর এ গোলকের চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে জল, আর এক ভাগ স্থল।

আমরা অবশ্য পৃথিবী বলতে প্রধানতঃ মাটিই বুঝি। তার প্রমাণ আমরা একে ভূমণ্ডল বলি। এর কারণ আমরা ভূচর জীব—অর্থাৎ মাটির উপর বাস করি। জলচর জীবদের যদি শুধু জল-পিপাসা নয়, সেই সঙ্গে জ্ঞান-পিপাসা থাকৃত ও সেই সঙ্গে তাদের জ্ঞান তরল ভাষায় ব্যক্ত করবার ক্ষমতা থাকৃত, তাহলে তারা জিওগ্রাফি না রচনা করে, রচনা করত Hydrography। আর তারা কবিতা লিখত "আমার জন্মজলের উপর"! আর আমরা যাকে বলি মধুর রস, তার নাম তারা দিত লবণ রস। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ যে, আমাদের কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা কতটা মাটিগত,—অর্থাৎ আমরা মনে প্রাণে কতটা জিওগ্রাফির অধীন।

এ সত্ত্বেও মানুষের কৌতূহল ক্রমান্বয় পঞ্চভূতের প্রথম ভূত ক্ষিতিকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের যে মনোভাবকে আমরা ধর্ম্ম-মনোভাব বলি, তার কারবার ত পঞ্চম ভূত ব্যোমকে নিয়ে। তা ছাড়া মানুষে আবহমানকাল এই পঞ্চভূতের কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে, কার পেটে কে জন্মেছে, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে ও বকাবকি করেছে। যা আছে তাকে মূল সত্য বলে সে কখনও মেনে নিতে পারে নি। কোথেকে সে জন্মালো, এ প্রশ্ন সে যুগে যুগে জিজ্ঞাসা করে এসেছে। এ পৃথিবী নামক গোলকটির সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন যে, জলই আদি (অপ এব সসর্জ্জাদৌ) সৃষ্টি। জল থেকেই মাটি উদ্ভূত। একালের বৈজ্ঞানিকেরাও ঐ একই কথা বলছেন। তাঁদের মতে এ পৃথিবী আগে জলময় অথবা জলমগ্ন ছিল, পরে জল থেকে মাটি উদ্ভূত হয়েছে। ভাগ্যিস হয়েছে, নচেৎ জিওগ্রাফি নামক বিজ্ঞান আমাদের মন থেকে উদ্ভূত হত

না। যখন পৃথিবী জলময় ছিল, তখন পৃথিবী একাকার ছিল। একা-
কারের কোনরূপ জ্ঞান হতে পারে না, হতে পারে শুধু ধ্যান। এ কথা মনুও বলে গিয়েছেন—

"আসীদিদং তমোভুতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

যেদিন মাটির উদ্ভব হল, সেই দিনই পৃথিবীর নানা আকার ঘট্‌ল, সেই দিন থেকেই তা জ্ঞানের বিষয় হল।

পৃথিবীর ভাগ

এখন শোনো, অপ্‌ থেকে যখন ক্ষিতির উদ্ভব হল, তখন মাটি একলক্ত ভাবে উদ্ভূত হল না, হল খণ্ড খণ্ড ভাবে। প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বলেন যে, মেদিনী সপ্তদ্বীপ আকারে ব্যক্ত হয়েছে।

এই দ্বীপ শব্দটার অর্থ তোমরা সবাই জানো। যার চারিদিকে জল আর মাঝখানে স্থল, তাকেই আমরা বলি দ্বীপ। এ হিসাবে আজকের দিনে পৃথিবীতে সাতটি নয়, অসংখ্য দ্বীপ আছে। সমুদ্রের মধ্যে থেকে অসংখ্য ছোটবড় দ্বীপ মাথা তুলে রয়েছে।

সুতরাং এ স্থলে সপ্তদীপ অর্থে সাতটি মহাদ্বীপ বুঝতে হবে। এই মহাদ্বীপকে আমরা একালে মহাদেশ বলি। আজকের দিনে আমরা পৃথিবীকে চারটি মহাদেশে ভাগ করি—যথা ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা। অষ্ট্রেলিয়াকে আমরা আজও মহাদ্বীপ বলেই জানি, মহাদেশ বলে মানিনে।

মহাদেশ বলতে যদি মহাদ্বীপ বোঝায়, তাহলে পৃথিবীতে চারটি নয়,

তিনটি মাত্র মহাদ্বীপ আছে ঃ—প্রথম ইউ-রেসিয়া, দ্বিতীয় আফ্রিকা, তৃতীয় আমেরিকা। গ্লোবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে যে, গোটা ইউরোপ ও গোটা এসিয়ার ভিতর কোথাও জলের ব্যবধান নেই। এ দুই দেশের জমি একলক্ত। আর এই আদি মহাদেশটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। এর উত্তরে Arctic Sea, দক্ষিণে Indian Ocean, পশ্চিমে Atlantic ও পূর্ব্বে Pacific Ocean ; আর আফ্রিকার উত্তরে ও পশ্চিমে Atlantic এবং দক্ষিণে ও পূর্ব্বে Indian Ocean। আর আমেরিকার পশ্চিমে Pacific, পূর্ব্বে Atlantic, উত্তরে উত্তর-Arctic ও দক্ষিণে দক্ষিণ-Arctic সাগর। Eurasia-র সঙ্গে অপর দুটি মহাদেশের গড়নেরও একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। Eurasia-র বিস্তার পুব হতে পশ্চিমে, অপর দুটির উত্তর হতে দক্ষিণে। অর্থাৎ ইউরেসিয়া লম্বার চাইতে চওড়ায় বেশি ; আফ্রিকা ও আমেরিকা চওড়ার চাইতে লম্বায় বেশি। এই আকারভেদ একদেশের সঙ্গে অপর দেশের অনেক প্রভেদ ঘটিয়েছে।

তোমরা সবাই জানো যে Eurasia ও আফ্রিকাকে আমরা প্রাচীন পৃথিবী বলি, ও আমেরিকাকে নবীন। এর প্রধান কারণ প্রাচীন পৃথিবীর লোক পাঁচ শ' বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার অস্তিত্বের কথা জানত না। তবে এ নাম শুধু লৌকিক নয়, বৈজ্ঞানিক হিসেবেও ঠিক। এই নবীন পৃথিবীর জন্ম প্রাচীন পৃথিবীর পরে হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক বিষয়ে এই নতুন পৃথিবী প্রাচীন পৃথিবীর ঠিক উল্টো। বিলাতে (Greenwich) যখন দিন দুপুর, অমেরিকায় (New Orleans) তখন রাতদুপুর। কেন এরকম হয়, সে কথা আর আজ বলব না ; কারণ তা বোঝাতে হলে আমাকে মাটি থেকে আকাশে উঠতে হবে। এ ব্যাপারের ব্যাখ্যার ভিতর শুধু

পৃথিবী নয়, সূর্য্যচন্দ্রকেও টেনে আনতে হবে। কেননা জিওগ্রাফি কতক হিসেবে Astronomy-র অন্তর্ভূত। আর Astronomy তোমরাও জানো না, আমিও জানিনে।

উত্তর খণ্ড দক্ষিণ খণ্ড

আর একটি কথা শোনো। আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে এই বিশ্ব আদিতে ছিল ব্রহ্মাণ্ড নামে একটি অণ্ড। পরে ভগবান সেই অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করে', তার উর্দ্ধখণ্ড দিয়ে স্বর্গ ও অধঃখণ্ড দিয়ে পৃথিবী রচনা করেন—আর এ দুয়ের মধ্যে আকাশ সৃষ্টি করেন। কিন্তু একালে আমরা পৃথিবীকে আধখানা ডিমের সঙ্গে তুলনা করিনে; আমরা বলি পৃথিবীর চেহারা ঠিক একটি কমলা লেবুর মত।

সেই কমলা লেবুটিকে যদি ঠিক মাঝখানে কাটো, তাহলে এই কাটা জায়গাটার নাম হবে Equator; তার উপরের আধখানার নাম হবে উত্তর hemisphere, আর নীচের অংশটির নাম হবে দক্ষিণ hemisphere। পৃথিবীর এই দুই খণ্ডের চরিত্র কোন কোন বিষয়ে ঠিক পরস্পরের বিপরীত। যথা, উত্তরাখণ্ডে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণাখণ্ডে তখন শীতকাল। তারপর এই দুই খণ্ডের গড়নেও ঢের প্রভেদ আছে। দক্ষিণাখণ্ডে যতখানি মাটি আছে, উত্তরাখণ্ডে প্রায় তার দ্বিগুণ আছে। এর থেকে অনুমান করতে পার যে, উত্তরাখণ্ডের জলবায়ুর সঙ্গে দক্ষিণ খণ্ডের জলবায়ুর বিশেষ প্রভেদ আছে। আর জলবায়ুর প্রভেদ থেকেই ভৌগোলিক হিসেবে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের প্রভেদ হয়। তোমরা সবাই জানো যে, জল ও বায়ু স্থির পদার্থ নয়—ও দুই-ই চঞ্চল, ও দুয়েরই স্রোত

আছে। অপ্ ও মরুতের স্রোতের মূল কারণ হচ্ছে সূর্য্যের তেজ; কিন্তু ক্ষিতি এই দুই স্রোতকে বাধা দিয়ে তাদের গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডে বেশি পরিমাণ মাটি আছে, সে খণ্ডের জলবায়ুর গতি, যে খণ্ডে জল বেশি, সে দেশ হতে বিভিন্ন।

ইউরেশিয়া

(১)

এখন ইউরেসিয়ার বিশেষত্ব এই যে, এ মহাদেশটি সম্পূর্ণ পৃথিবীর উত্তর খণ্ডের অন্তর্ভূত। অপরপক্ষে আমেরিকা ও আফ্রিকার কতক অংশ উত্তর খণ্ডে ও কতক অংশ দক্ষিণ খণ্ডে অবস্থিত। এর ফলে আমরা যাকে সভ্যতা বলি, সে বস্তু ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোমের কৃপায় ইউরেসিয়াতেই জন্মলাভ করেছে। আমেরিকা ও আফ্রিকা সভ্যতার জন্মভূমি নয়। ও দুই মহাদেশে যে সভ্যতার আমরা সাক্ষাৎ পাই, সে সভ্যতার ইউরেসিয়া হতে আমদানী। সমগ্র আমেরিকা ও আফ্রিকার উত্তর দক্ষিণ ভাগ ত ইউরোপের উপনিবেশ। আর পুরাকালে আফ্রিকার যে অংশে সভ্যতা প্রথম দেখা দেয়, সেই ইজিপ্ট উত্তরাখণ্ডের অন্তর্ভূত ও এসিয়ার সংলগ্ন। সুতরাং এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, সে সভ্যতার জন্মভূমি হচ্ছে এসিয়া, আর সেকালে ইজিপ্ট ছিল এসিয়ার একটি উপনিবেশ।

(২)

এর থেকে তোমরা বুঝতে পার্‌বে যে, কোনো দেশের ইতিহাস বুঝতে হলে সে দেশের জিওগ্রাফিও আমাদের জানা চাই। এ যুগের

মানুষ জিওগ্রাফির তাদৃশ অধীন না হলেও, আদিতে যে বিশেষ অধীন ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস *জান্‌তে আমরা সবাই উৎসুক। সে ইতিহাস ভারতবর্ষের জমির* উপরেই গড়ে উঠেছে, সেই জন্যই সেই জমির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে আমি উদ্যত হয়েছি। এখন এই কটি কথা তোমরা মনে রেখো যে, এ পৃথিবী সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভূত ও তার সঙ্গে নানারূপ যোগসূত্রে গ্রথিত। তারপর এই পৃথিবীর উত্তরাখণ্ডে ইউরেসিয়া অবস্থিত। আর এই মহাদেশের যে অংশকে আমরা এসিয়া বলি, ভারতবর্ষ তারই একটি ভূভাগ। আর এই ভূভাগের রূপগুণ বর্ণনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমে সৌরমণ্ডল থেকে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তারপর পৃথিবী থেকে তার উত্তরাখণ্ডকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তারপর তার উত্তরাখণ্ড থেকে ইউরেসিয়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তারপর ইউরেসিয়া থেকে এসিয়াকে পৃথক করে নিয়ে, তারপর এসিয়া থেকে অপরাপর দেশকে বাদ দিলে তবে আমরা ভারতবর্ষ পাই। এ দেশ অপরাপর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নাহলেও বিভিন্ন। সুতরাং একে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে ধরে নিয়ে তার বর্ণনা করা যায়। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, বিদেশের সামান্য জ্ঞান না থাক্‌লে স্বদেশেরও বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ কথা সত্য। কিন্তু অপরপক্ষে এ কথাও সমান সত্য যে, স্বদেশের বিশেষ জ্ঞান না থাকলে বিদেশের সামান্য জ্ঞান লাভ করা কঠিন। ও ক্ষেত্রে আমরা নাম শিখি—কিন্তু দেশ চিন্‌তে শিখিনে। এই কারণে আজকাল এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বলেন যে, প্রথমে বাড়ীর জিওগ্রাফি শিখে, তারপর দেশের জিওগ্রাফি শেখাই কর্ত্তব্য। কারণ ছোটর জ্ঞান থেকেই মানুষকে

বড়র জ্ঞানে অগ্রসর হতে হয়, ঘর থেকেই বাইরে যেতে হয়। আমি যে এ প্রবন্ধে তার উল্টো পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, বড় থেকে ছোটতে, বাইরে থেকে ঘরে আস্‌ছি, তার প্রথম কারণ আমি বৈজ্ঞানিক নই—সাহিত্যিক; আর তার দ্বিতীয় কারণ, আমি তোমাদের মনে এই সত্যটি বসিয়ে দিতে চাই যে, ভারতবর্ষ একটা সৃষ্টিছাড়া দেশ নয়।

এসিয়া

(১)

এসিয়া ব'লে ইউরোপ থেকে কোন পৃথক মহাদেশ নেই, এ কথা তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু বহুকাল থেকে মানুষ এই এক মহাদেশকে দুই মহাদেশ বলে আস্‌ছে। ভৌগোলিক হিসাবে না হোক্, লৌকিক মতে এসিয়া একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলে যখন গ্রাহ্য, তখন এ ভূভাগকে একটি পৃথক মহাদেশ বলে মেনে নেওয়া যাক্।

ভারতবর্ষ এই মহাদেশের অন্তর্ভূত, অতএব এসিয়ার চেহারাটা এক নজর দেখে নেওয়া যাক্।

এ যুগের জাপানের একজন বড় কলাবিদ্ ও সাহিত্যিক কাকুজো ওকাকুরা, তাঁর Ideals of the East নামক গ্রন্থের আদিতেই বলেছেন যে, Asia is one। এ কথাটা East-এর ideal হতে পারে, কিন্তু বস্তুগত্যা সত্য নয়।

ভৌগোলিক হিসেবে এসিয়া চারটি উপ-মহাদেশে (sub-continent) বিভক্ত। কি হিসাবে এসিয়াকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়, তা এখন শোনো।

মনুভাষ্যকার মেধাতিথি বলেছেন যে, "জগৎ সরিৎ সমুদ্রা শৈলাত্মাত্মকম্"—*অর্থাৎ এ জগৎ নদী, সমুদ্র ও পাহাড় দিয়ে গড়া।* জগৎ সম্বন্ধে এ কথাটা যে কতদূর সত্য, তা বলতে পারিনে—তবে একেবারে যে বাজে নয়, তার প্রমাণ চন্দ্র উপগ্রহে পাহাড় আছে, Mars গ্রহে নদী আছে এবং সম্ভবত অপর কোন গ্রহে সমুদ্রও থাকতে পারে। সে যাই হোক্, পৃথিবী সম্বন্ধে মেধাতিথির উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আর এই তিন বস্তুই পৃথিবীকে নানাদেশে বিভক্ত করে রেখেছে।

সমুদ্রের ব্যবধানেই যে মহাদেশ হয়, তার কারণ সমুদ্র আগে ছিল অলঙ্ঘ্য আর এখন হয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য। শৈলমালা সমুদ্রের চাইতে কিছু কম অলঙ্ঘ্য বা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। সুতরাং পর্ব্বতের ব্যবধানও এক ভূভাগকে অপর ভূভাগ থেকে পৃথক করে রাখে।

কালিদাস বলেছেন যে, "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ পূর্ব্বাপরে তোয়নিধ্যবগাহ্য স্থিত পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।" ভারতবর্ষের উত্তরে স্থিত যে পর্ব্বতশ্রেণীর স্বদেশী অংশকে আমরা হিমালয় বলি, তা অবশ্য এসিয়ার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করছে না। কিন্তু হিমালয় বলতে আমরা যদি সেই শৈলমালা বুঝি, যে পর্ব্বতশ্রেণী সমগ্র এসিয়ার মেরুদণ্ড, আর যাকে এ যুগের ভৌগোলিকরা Central Mountains আখ্যা দিয়েছেন—তাহলে আমরা কালিদাসের উক্তি সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য। এ নগাধিরাজ সত্যসত্যই এসিয়ার পূর্ব্ব ও পশ্চিম তোয়নিধিতে অবগাহন করে অবস্থিতি করছে। পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর ও পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এ পর্ব্বতশ্রেণী

বিস্তৃত। আর পৃথিবী বলতে যদি আমরা স্থধু প্রাচীন পৃথিবী বুঝি, তাহলেত কালিদাসের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। কারণ এসিয়ার এই Central Mountains হচ্ছে প্রাচীন পৃথিবীর mid-world mountains-এরই অংশ। তারপর এ সমগ্র পর্ব্বতশ্রেণীকে হিমালয় বলা যেতে পারে ; কেননা এ পর্ব্বতের অধিকাংশই চির হিমের আলয়।

এই হিমালয়, ভাষান্তরে Central Mountains-এর মত বিরাট প্রাচীর পৃথিবীর আর কোনও মহাদেশকে দুভাগে বিভক্ত করে নি। এ প্রাচীরের উত্তরদেশকে এসিয়ার উত্তরাপথ এবং দক্ষিণদেশকে দক্ষিণাপথ বলা যেতে পারে। এই প্রাচীর যে কত উঁচু তা ত তোমরা সবাই জানো। এই ভারতবর্ষের উত্তরেই এর পাঁচটি শৃঙ্গ আছে, যার প্রতিটির উচ্চতা হচ্ছে পঁচিশ হাজার ফুটের চাইতেও বেশি। কাশ্মীরে নাংঘা পর্ব্বত উঁচুতে ২৬,৬০০ ফিট, তিব্বতে নন্দদেবী ২৫,৬০০, নেপালে ধবলাগিরি ২৬,৫০০ ফিট, Everest ২৯,০০০, কিন্‌চিন্‌জঙ্ঘা ২৮,০০০। এখন এ পর্ব্বত প্রস্থে কত বড় তা শোনো।

ভারতবর্ষের পশ্চিমে যে দেশ আছে, সে দেশকে আমরা ইরাণ বলি ; আর উত্তরপশ্চিমে যে দেশ আছে, তাকে তুরাণ বলি। ইরাণ ও তুরাণে এই পর্ব্বত কোথাও চার শ' মাইল, কোথাও আট শ' মাইল চওড়া। এ মহাপর্ব্বতের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। তাদের মিলন ভূমি হচ্ছে Pamir অধিত্যকা। এ অধিত্যকাও প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু। এই পামিরের উত্তরে এ পর্ব্বতের প্রস্থ হচ্ছে ১২০০ মাইল, এবং এর সঙ্গে এ পর্ব্বতের নিম্নাংশ অর্থাৎ উপত্যকাগুলি যদি যোগ দেওয়া যায়, তাহলে এ ব্যবধানের প্রস্থ হয় দু' হাজার মাইল—অর্থাৎ

হিমালয় হতে কন্যাকুমারিকা যতদূর, ততদূর। এর থেকে দেখতে পাচ্ছ যে, এসিয়ার উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথকে এক দেশ বলা কতদূর সঙ্গত।

এই কারণে এসিয়ার উত্তরাখণ্ডকে একটি উপমহাদেশ বলা হয় আর তার দক্ষিণাপথের পশ্চিম ভাগকে দ্বিতীয়, পূর্ব্ব ভাগকে তৃতীয়, তার মধ্য ভাগকে চতুর্থ উপমহাদেশ বলা যায়।

এই মধ্যদেশই ভারতবর্ষ। ভূমধ্য পর্ব্বত থেকে এই চারটি উপ-মহাদেশ ঢাল হয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে এসেছে। ফলে উত্তর ভাগের সকল নদী উত্তরবাহিনী, ও তারা সব গিয়ে পড়ে Arctic সমুদ্রে; পশ্চিম ভাগের জল গড়িয়ে পড়ে ভূমধ্য সাগরে, পূর্ব্ব ভাগের জল প্রশান্ত মহাসাগরে ও মধ্যদেশের জল ভারত মহাসাগরে। মধ্য এসিয়া পর্ব্বতময়। আর এ পর্ব্বত অর্দ্ধেক এসিয়া জুড়ে বসে আছে। আর তার চারপাশের চার ভাগের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উত্তর দেশ অর্থাৎ Siberia সমতল ভূমি কিন্তু জলবায়ুর গুণে মানুষের বাসের পক্ষে অনুকূল নয়। পশ্চিম একে পাহাড়ে উপরন্তু নির্জ্জলা দেশ। সে দেশের জমিতে ফসল একরকম হয় না বল্‌লেই চলে। ইরাণ তুরাণের অধিকাংশ লোক গৃহস্থ নয়—তারা অন্নের সন্ধানে তাঁবু ঘাড়ে করে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। বাকী দুটি ভূভাগ, ভারতবর্ষ ও চীনদেশ মানুষের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এ দুটি দেশ মুখ্যতঃ সমতল ভূমি, আর সে ভূমি কর্ষণ করে অন্নবস্ত্র দুই লাভ করা যায়; অতএব এ দুই দেশের লোকই গৃহস্থ হয়েছে। আর শাস্ত্রে বলে মানুষের সকল আশ্রম গার্হস্থ্য আশ্রমেরই বিকল্প মাত্র।

(২)

এসিয়াকে ত্যাগ করবার পূর্ব্বে সে মহাদেশ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলছি, যা শুনে তোমরা একটু চম্‌কে যাবে। এ মহাদেশের ম্যাপে একটি দেশ ভুলক্রমে ঢুকে পড়েছে, যেটি ভৌগোলিক হিসেবে এসিয়ার নয়, আফ্রিকার অঙ্গ। সে দেশের নাম আরব দেশ। এই আরব দেশ প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিরই একটি অংশ। তোমরা বোধ হয় জানো যে, মরুভূমির একটি ধর্ম্ম হচ্ছে পার্শ্ববর্ত্তী দেশকে আক্রমণ করা। হাওয়ায় তার তপ্ত বালি উড়ে এসে পার্শ্ববর্ত্তী দেশকে চাপা দেয়। তার স্পর্শে গাছপালা তৃণপুষ্প সবই মারা যায়। মরুভূমির স্থধু বালুকা নয়, তার বায়ুও সমান মারাত্মক। যে দেশের উপর দিয়ে সে বাতাস বয়ে যায়, সে দেশের রসকস্ একেবারে শুখিয়ে যায়। সাহারার এই নিজস্ব বাতাসের নাম Trade winds। একবার Globe-এর দিকে তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে যে, এই Trade winds চলার পথটি হচ্ছে আগাগোড়া পোড়ামাটি।

সাহারামরুভূমি আরব দেশের ভিতর দিয়ে এসে প্রথমে পারস্তের দক্ষিণ ভাগকে, তারপর আরও এগিয়ে ভারতবর্ষের সিন্ধু দেশকে আক্রমণ করে। ফলে আরব থেকে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। এ আক্রমণে বাধা দিয়েছে রাজপুতানা। রাজপুতানার চিরগৌরব এই যে, এই রাজপুতানাই হিন্দুস্থানকে এই ক্রমবর্দ্ধমান আফ্রিকার মরুভূমির কবল থেকে রক্ষা করেছে।

এই আরব দেশ যে ভুলক্রমে এসিয়ার ম্যাপে ঢুকে গেছে, তার কারণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানচিত্রকাররা লোহিত সমুদ্রকে আফ্রিকা

ও এসিয়ার মধ্যে পরিখা বলে ধরে নিয়েছিলেন। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায়, এ সমুদ্রও আসলে মরুভূমি। এর উপরে যেটুকু জল আছে, তা ভারত-মহাসাগরের দান।

(৩)

ভারতবর্ষকে যদি এসিয়াখণ্ডের একটি উপ-মহাদেশ না বলে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলা যায়, তাহলেও কথাটা অসঙ্গত হয় না।

ভারতবর্ষ মাপে ১৫,০০০,০০০ বর্গ মাইল। এক চীন ব্যতীত এত বড় দেশ এসিয়ায় আর কোথাও নেই। এসিয়ার রুসিয়া, ম্যাপে দেখতে প্রকাণ্ড দেশ; কিন্তু এর দক্ষিণাংশে এত বড় বড় হ্রদ মরুভূমি তৃণ কান্তার ও পর্ব্বত আছে যে, সে অংশটিকে একটি দেশ বলা যায় না। কারণ সে ভূভাগ মানুষের বাসের অযোগ্য। আর এর উত্তরাংশের জমি সমতল হলেও আজও জমাট মাটি হয়ে ওঠে নি। এ দেশে গাছপালা অতি বিরল, যে দুটি চারটি আছে তারা সব বামন। এরকম দেশ যে কৃষিকার্য্যের জন্য অনুপযোগী, সে কথা বলাই বাহুল্য। ফলে সাইবিরিয়া একরকম জনশূন্য বললেই হয়।

ভারতবর্ষ যে আকারে বিপুল, সুধু তাই নয়। এ দেশ এসিয়ার অপরাপর দেশ থেকে একরকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এর উত্তরে হিমালয়ের গগনস্পর্শী প্রাচীর; আর তিন দিকে ভারত মহাসাগরের অতলস্পর্শী পরিখা। তোমরা ভেবোনা যে আমি ভুল করছি। আরব সাগর, বঙ্গ উপসাগর প্রভৃতি নাম আমিও জানি;

কিন্তু ও-সব সাগর উপসাগর ভারত মহাসাগরেরই অংশ মাত্র। ভারতবর্ষ তার উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব কোণে সুধু অপর দেশের সঙ্গে সংলগ্ন। তার উত্তরপশ্চিমে আফগানিস্থান, এবং উত্তরপূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ। কিন্তু এ দুই দিকেই আবার অতি দুর্গম পর্ব্বতের ব্যবধান আছে। যে পর্ব্বতশ্রেণী আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানকে হিন্দুস্থান থেকে পৃথক করে রেখেছে, সে পর্ব্বতশ্রেণীর অবশ্য দুটি দুয়োর আছে—Khyber Pass ও Bolan Pass—যার ভিতর দিয়ে এ দুই দেশে মানুষে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে যাবার পথ আজও বঙ্গোপসাগরের জলপথ।

(৪)

দেখতে পাচ্ছ স্বয়ং প্রকৃতিই ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ করে গড়েছেন।

এখন দেখা যাক্, এই সমগ্র দেশটার আকার কিরকম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সমগ্র পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলতেন। সম্ভবত পৃথিবী বলতে তাঁরা ভারতবর্ষ বুঝতেন। কেননা ভারতবর্ষ সত্য সত্যই ত্রিকোণ।

মানুষে যতক্ষণ জ্যামিতির কোনও মূর্ত্তির সঙ্গে কোনও দেশকে মেলাতে না পারে, ততক্ষণ তার মনস্তুষ্টি হয় না; যদিও জ্যামিতির কোন আকারের সঙ্গে কোন দেশই হুবহু মিলে যায় না। পৃথিবীকে আমরা বলি গোলাকার। কথাটা মোটামুটি সত্য। কিন্তু জ্যামিতির বৃত্তের উত্তরদক্ষিণ চাপা নয়। ইউক্লিডের তৃতীয় অধ্যায়ে কমলালেবুর কোনও স্থান নেই। এই কথাটা মনে রাখলে, মহাভারতে ভারতবর্ষকে

যে একটি সমভুজ ত্রিকোণ দেশ বলা হয়েছে, সে উক্তিকে গ্রাহ্য করে নিতে আমাদের কোনও আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

পৃথিবীতে এমন কোনই দেশ নেই, যা সম্পূর্ণ একাকার। ভারতবর্ষও একাকার নয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষকেও নানা খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। এখানে একটি কথা বলে রাখি। রাজ্যের ভাগের সঙ্গে ভৌগোলিক ভাগের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। অর্দ্ধেক পৃথিবী আজ ব্রিটিশরাজের অধীন; কিন্তু তাই বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষকে পাগল ছাড়া আর কেউ এক দেশ বলবে না। আমি যে ভাগের কথা বলছি, সে ভৌগোলিক ভাগ।

আমাদের শাস্ত্রে ভারতবর্ষকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পুরাণকারদের মতে ভারতবর্ষ নবখণ্ড। বরাহমিহির প্রভৃতি গণিৎ-শাস্ত্রীরা পৌরাণিকদের সঙ্গে একমত। যদিচ এ দুয়ের বর্ণিত নবখণ্ডের মিল নেই। মহাভারতের মতে এ দেশ চার খণ্ডে বিভক্ত। চারটি Equilateral triangle-এর সমষ্টি হচ্ছে ভারতবর্ষ নামক বড় Equilateral triangle। জ্যামিতির হিসেব থেকে যদিও এ বর্ণনা সত্যের কাছ ঘেঁসে যায়, কিন্তু ভৌগোলিক হিসেব থেকে অনেক দূরে থাকে। সে যাই হোক্, সংস্কৃত সাহিত্যে আর একরকম ভাগের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগের নাম উত্তরাপথ, অপরটির দক্ষিণাপথ। এই লৌকিক ভাগটিই প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক। উত্তরাপথ ভৌগোলিক হিসেবে দক্ষিণাপথ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন।

হিমালয় যেমন সমস্ত এসিয়ার মেরুদণ্ড, বিন্ধ্যপর্ব্বত তেমনি ভারত-

বর্ষের মেরুদণ্ড। এ স্থলে আমি সাতপুরা ও আরাবলি পর্ব্বতকে বিন্ধ্য নামে অভিহিত করছি। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যের দেশকে উত্তরাপথ বলা যায়—আর দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত থেকে ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী দেশকে দক্ষিণাপথ বলা যায়। কিন্তু তোমরা ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে, আরাবলি পর্ব্বতের পশ্চিমে ও রাজমহলের পূর্ব্বেও অনেকখানি জমি পড়ে রয়েছে। এই পশ্চিম অংশের নাম পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশ, আর পূর্ব্ব অংশের নাম বঙ্গদেশ ও আসাম। এ দুটিকেও উত্তরাপথের অন্তর্ভূত করে নিতে হবে।

উত্তরাপথ

প্রথম জিনিষ যা চোখে পড়ে সে হচ্ছে এই যে, এই বিস্তৃত ভূভাগের ভিতর কোনরূপ পাহাড়পর্ব্বত নেই—সমস্ত উত্তরাপথ সমতল ভূমি। এর ভিতর এক জায়গায় শুধু একটু অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি আছে। পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের মিলনস্থল হচ্ছে সেই উচ্চ ভাগ। উত্তরাপথের এই জায়গাটার গড়ন কাছিমের পিঠের মত। ফলে এ স্থানের পশ্চিমের যত নদী সব পশ্চিমবাহিনী ও পূর্ব্বের যত নদী সব পূর্ব্ববাহিনী।

এই পশ্চিম ভাগের নদী পাঁচটির নাম ঝিলম, চেনাব, রাবি, বিয়াস ও সৎলেজ। এ পাঁচটিরও জন্মভূমি হচ্ছে হিমালয়, আর এ পাঁচটিই পথিমধ্যে এ-ওর সঙ্গে মিলিত হয়ে শেষটা ভারতবর্ষের সব চাইতে পশ্চিমের নদী সিন্ধুনদের সঙ্গে মিশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। তোমরা বোধহয় জানো যে, পাহাড় থেকে নদী যে মাটি কেটে নিয়ে আসে, সেই মাটি দিয়েই সমতল

ভূমি তৈরী হয়। এই পঞ্চ নদের কৃপায় পঞ্চনদ দেশ ওরফে পাঞ্জাব তৈরী হয়েছে। আর এই দেশটাকে Indus Valley বলা হয়। কারণ সিন্ধুই হচ্ছে এই পঞ্চ নদের ভিতর মহানদ।

(১)

উত্তরাপথের পূর্ব্ব ভাগের প্রধান নদীগুলির নাম যমুনা, গঙ্গা, গোমতী, গোগ্‌রা, গণ্ডক ও কুশি। এ সকল নদীরই উৎপত্তি হিমালয়ে, আর এদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে গঙ্গা। অপর পাঁচটি একে একে গঙ্গায় মিশে গিয়েছে। সিন্ধুনদের সঙ্গে গঙ্গার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সিন্ধুনদ তার আগাগোড়া জল হিমালয়ের কাছ থেকে পায়। গঙ্গা কিন্তু কিছু জল বিন্ধ্যপর্ব্বতের কাছ থেকেও পায়। চম্বাল ও সোন এই দুই নদীরই জন্মভূমি হচ্ছে বিন্ধ্যপর্ব্বত। আর এই দুই নদীই উত্তরবাহিনী হয়ে এসে গঙ্গায় পড়েছে। সংস্কৃত ভাষায় জলের আর এক নাম জীবন। গঙ্গাই হচ্ছে উত্তরাপথের জীবন। ও দেশের বুকের ভিতর দিয়ে গঙ্গা যদি রক্তের মত বয়ে না যেত, তাহলে উত্তরাপথের প্রাণবিয়োগ হত। এই গাঙ্গেয় দেশই হচ্ছে প্রকৃত হিন্দুস্থান।

আরাবলি পর্ব্বতের পশ্চিমে ও দক্ষিণে হচ্ছে মরুভূমি। সিন্ধুনদ দক্ষিণাংশে এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে বয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই সিন্ধুনদীর দু' পাশের দেশের নাম সিন্ধুদেশ।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের একরকম গা ঘেঁসে পূর্ব্বে 'অনেক দূর এসে গঙ্গা রাজমহলের কাছে পর্ব্বতের বাধা হতে অব্যাহতি লাভ করে', দক্ষিণ বাহিনী হয়ে সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তারপর দক্ষিণে অনেক

দূর এসে গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়েছেন। এই ব্রহ্মপুত্রেরও জন্মস্থান হিমালয়। ব্রহ্মপুত্র লক্ষ্ণৌয়ের উত্তরে হিমালয় থেকে বেরিয়ে, পূর্ব্বমুখে বহুদূর পর্য্যন্ত হিমালয়ের ভিতর দিয়েই প্রবাহিত হয়ে, ভুটানের পূর্ব্বে এসে দক্ষিণবাহিনী হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশে গেছেন। তারপর এই মিলিত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র আরও দক্ষিণে এসে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়লেন। মেঘনার জন্মভূমি হচ্ছে গারো লুসাই পর্ব্বত। এই তিন নদীতে মিলে বাঙলা দেশ গড়েছে।

উত্তরাপথের পশ্চিম দেশ সিন্ধুদেশ যেমন শুথ্নো, তার পূর্ব্বদেশ বাঙলা তেমনি ভিজে। সিন্ধুদেশের সক্কর নামক স্থানের মত গরম জায়গা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। তার পাশে রোড়ী নামক স্থানে গত বারো বৎসরে মোটে ছ'পসলা বৃষ্টি হয়েছে। অপরপক্ষে বাঙলার মত ভিজে দেশও ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই।

দক্ষিণাপথ

(১)

এখন দক্ষিণাপথে যাওয়া যাক্।

এ ভূভাগ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এটি উত্তরাপথ থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন।

অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের মাথা নীচু করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে মাথাকে ভূলুণ্ঠিত করতে পারেননি। ফলে এই দুই ভাগের ভিতর যাতায়াতের সুগম পথ নেই। উত্তরাপথ থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে এমন কোনও নদী নেই, সুতরাং এ দুই দেশের ভিতর

জলপথ নেই। গঙ্গানদী বিন্ধ্যপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করে ও সিন্ধুনদ সে পর্ব্বতকে বাঁয়ে ফেলে রেখে তারপর সমুদ্রে এসে পড়েছে।

তারপর এ দুয়ের ভিতর কোনও স্থলপথও নেই। এক রেলের গাড়ী ছাড়া আর কোনও রকম গাড়ী—গরুর, ঘোড়ার কি উটের—বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক পাশ থেকে অপর পাশে যেতে পারে না।

মানুষে পায়ে হেঁটে যখন হিমালয় পার হয়ে যায়, তখন বিন্ধ্যপর্ব্বত অবশ্য তার চলাচলের পথ বন্ধ করতে পারেনি। মানুষের অগম্য স্থান ভূ-ভারতে নেই—কিন্তু দুর্গম স্থান আছে। এই বিন্ধ্য অতিক্রম করবার পথ সেকালে অত্যন্ত দুর্গম ছিল। রামচন্দ্র পায়ে হেঁটে বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হয়ে দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরতি বেলায় তিনি বিমানে চড়ে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করাই বেশি আরামজনক অতএব সুযুক্তির কাজ মনে করেছিলেন।

সেকালে বিন্ধ্যপর্ব্বত প্রদক্ষিণ করে আসবারও বিশেষ অসুবিধা ছিল। আরাবলি পর্ব্বতের পশ্চিম দিয়ে আসতে হলে মরুভূমি অতিক্রম করে আস্‌তে হত। অপরপক্ষে রাজমহলের পূর্ব্ব দিয়ে বাঙলায় এসে সমুদ্রের ধার দিয়ে মাদ্রাজ পৌঁছতে অনেক দিন নয়, অনেক বছর লাগত। এক রাজা ও সন্ন্যাসী ছাড়া ওরকম দেশভ্রমণ বোধহয় সেকালে অপর কেউ করত না। সমগ্র ভারতবর্ষকে এ ভাবে প্রদক্ষিণ করতেন রাজা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে, আর সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে।

এই বিন্ধ্যপর্ব্বতের ভিতর একটি ফাঁক আছে—খাণ্ডোয়া নামক স্থানে। এলাহাবাদ থেকে বম্বে যাবার রেল পথ এই খাণ্ডোয়ার ফাঁক দিয়েই যায়। এবং সেকালে এই দুয়োর দিয়েই বোধহয় উত্তরাপথের

লোক দক্ষিণাপথে প্রবেশ করত। ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণাপথ হচ্ছে একটি বড় কৌটার মধ্যে আর একটি ছোট কৌটা।

(২)

দক্ষিণাপথ উত্তরাপথ থেকে সুধু বিচ্ছিন্ন নয়—বিভিন্ন, আকৃতিতেও, প্রকৃতিতেও।

উত্তরাপথকে একটি চতুর্ভুজ হিসেবে ধরা যায়, কিন্তু দক্ষিণাপথ হচ্ছে একটি স্পষ্ট ত্রিভুজ। একটি উল্টো পিরামিড, যার base হচ্ছে বিন্ধ্য, আর apex কুমারিকা অন্তরীপ। এর উভয় পাশই পাহাড় দিয়ে বাঁধানো। পশ্চিমদিকের পর্ব্বতের নাম পশ্চিমঘাট, পূর্ব্বদিকের পূর্ব্বঘাট। এই দুই পর্ব্বত এসে মিলিত হয়েছে কুমারিকা অন্তরীপের একটু উত্তরে। এর দক্ষিণে যে জায়গাটুকু আছে, তার পূর্ব্বে আর পাহাড় নেই, কিন্তু পশ্চিমে আছে Cardamom Hills.

উত্তরাপথ হচ্ছে সমতল ভূমি, কিন্তু দক্ষিণাপথ মালভূমি। অর্থাৎ ইরাণ দেশের মত এ দেশও হচ্ছে পর্ব্বতের উপত্যকা; সুধু ইরাণের উপত্যকা হচ্ছে প্রায় তিন হাজার ফিট উঁচু, ও দক্ষিণাপথের হাজার ফিট। সুতরাং এ পিরামিডকে পাথরে-গড়া বলা যেতে পারে। এ ভূভাগে সমতল ভূমি আছে সুধু পশ্চিমঘাটের পশ্চিমে ও সমুদ্রের উপকূলে, যে দেশকে আমরা মালাবার দেশ বলি; ও পূর্ব্ব সমুদ্রের উপকূলে, যে দেশকে আমরা করমণ্ডল বলি। দক্ষিণাপথের অন্তরেও কিছু কিছু সমতল ভূমি আছে, তার পরিচয় পরে দেব।

এই মালাবার দেশটি অতি সঙ্কীর্ণ, করমণ্ডল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। যদি একটি বিমানে চড়ে দূর থেকে দেখা যায় ত দেখা যাবে যে,

দক্ষিণাপথের পশ্চিম পাড় বেজায় মাথা উঁচু করে রয়েছে—পশ্চিমঘাট যেন সমুদ্র থেকে ঝাঁপিয়ে উঠেছে আর করমণ্ডল একেবারে সমুদ্রের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। এ অংশের তালিবন যেন সমুদ্র থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কালিদাস যে বলেছেন—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী, তমালতালী বনরাজি নীলা।
আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশে ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

সে বেলা হচ্ছে Coromandel Coast.

(৩)

দক্ষিণাপথের উত্তরে দুটি অপূর্ব্ব নদী আছে, নর্ম্মদা ও তাপ্তি। নর্ম্মদা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপত্যকার ভিতর দিয়ে, ও তাপ্তি সাতপুরা পর্ব্বতের দক্ষিণ পাদদেশ ঘেঁসে পশ্চিমবাহিনী হয়ে Gulf of Cambay-তে গিয়ে পড়ছে।

এ দুই নদী মানুষের বিশেষ কোনও কাজে লাগে না। এ নদী দুটি মানুষের যাতায়াতের জলপথ নয়। তারপর এদের পলিতে কোনও সমতল দেশ গড়ে ওঠেনি। এরা দুটিতে মিলে সাগরসঙ্গমের মুখে খালি একটুখানি মাটি তৈরী করেছে।

এ দেশের দক্ষিণের নদী কটি সবই পূর্ব্ববাহিনী। প্রথম গোদাবরী, দ্বিতীয় কৃষ্ণা, তৃতীয় কাবেরী। এই তিনটি নদীরই জন্মভূমি হচ্ছে পশ্চিম ঘাট, আর এ তিনটিই এসে পড়ছে বঙ্গ-উপসাগরে।

এই তিনটি নদীর উভয় কূলে অল্পস্বল্প সমভূমি আছে, যেখানে ফসল জন্মায়। এই তিনটি নদীর হাতে করমণ্ডল দেশ গড়ে উঠেছে। দক্ষিণা-

পথের ভিতর থেকে মালাবার ও কোঙ্কন যাবার কোনও পথ থাকৃত না, যদি না পশ্চিম ঘাটের ভিতর তিনটি ফাঁক থাকৃত—উত্তরে থালঘাট ও বোরঘাট, দক্ষিণে পালঘাট। এইখানেই Coimbatore নামক সহর। এই Coimbatore-এর দুয়োরই দাক্ষিণাপথের অন্তরের সঙ্গে তার পশ্চিম উপকূলের যোগরক্ষা করেছে। দক্ষিণাপথ ও বাঙলার ভিতর আর দুটি দেশ আছে—উত্তরে Central Provinces ও দক্ষিণে উড়িষ্যা।

Central Provinces পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা—উড়িষ্যার অনেকটাই সমভূমি। মহানদী এই সমভূমি গড়েছে। এ দুটি দেশ সম্ভবত কখনই দক্ষিণাভুক্ত হয়নি বলে একে উত্তরাপথের ভিতর টেনে আনা যায়। আজকাল আমরা যাকে Bombay Presidency ও Madras Presidency বলি, সে দুই এই দক্ষিণাপথেরই অন্তর্ভূত। সুধু সিন্ধু দেশটি বম্বের গভর্ণরের অধীন হলেও দক্ষিণাপথের অন্তর্ভূত নয়।

(৪)

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের উপরে চারিটি দেশ আছে, যেগুলি ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত। পশ্চিমে কাশ্মীর, তার পূর্ব্বে নেপাল, তার পূর্ব্বে সিকিম ও পূর্ব্বপ্রান্তে ভুটান।

কাশ্মীরের লোকের ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, নেপালেরও তাই; অপরপক্ষে সিকিম ভুটানের ভাষা চীন-বংশীয়। এই নেপালেই পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে আগত আর্য্যজাতি এবং পূর্ব্ব ও উত্তর থেকে আগত চীন জাতি মিলেমিশে একজাতি হয়ে গিয়েছে। এদেশে সুধু দুই জাতির নয়, দুই সভ্যতারও মিলন ঘটেছে। তাই নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম

পাশাপাশি বাস করছে। কাশ্মীরে অবশ্য হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম পাশাপাশি বাস করছে, কিন্তু এই দুই ধর্ম্ম পরস্পরের অস্পৃশ্য, ফলে উভয় ধর্ম্মই নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রক্ষা করে চলেছে। অপরপক্ষে নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের বিকার অথবা নেপালের হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকার বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সিকিম, ভুটানের সংস্রব আসলে বাঙলা দেশের সঙ্গে। শুনতে পাই, বাঙলার লোকের দেহে চীনের রক্ত আছে। সেই সঙ্গে বাঙালীর মনেও কিঞ্চিৎ চৈনিক ধর্ম্ম আছে কিনা বলতে পারিনে।

(দেশের পণ্ডিত লোক সব আজকাল বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দেশে মহা খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করেছেন। বেদ উদ্ধারের পর আমাদের পণ্ডিতরা যদি তন্ত্রের সন্ধানে বেরন, তাহলে আমার বিশ্বাস তাঁদের উত্তর-পশ্চিম দেশকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ ত্যাগ করে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্বে আসতে হবে। তখন research work-এর পীঠস্থান হবে প্রথমে ভুটান, পরে সিকিম। তন্ত্র-শাস্ত্রের পুঁথি খুললেই পাতায় পাতায় মহাচীনের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। সে যাই হোক্, ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরাণ ও উত্তরে তুরাণের মত তার পূর্ব্বে মহাচীনকেও পুরাতত্ত্ববিৎ, ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎরা উপেক্ষা করতে পারেন না। সম্প্রতি অবগত হয়েছি যে, পণ্ডিতরা আজকাল Tarim দেশ নিয়েই উঠে পড়ে লেগেছেন। Tarim অবশ্য চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত তুর্কস্থানে। সুতরাং আশা করা যায় যে, তাঁরা খোটান থেকে ভুটানে অচিরে নেবে পড়বেন।)

ভারতবর্ষের প্রকৃতি।

(১)

এতক্ষণে তোমরা ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ, আর তার অন্তর্ভূত খণ্ড দেশগুলির আকৃতির মোটামুটি পরিচয় পেলে। এখন তার প্রকৃতির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাক্।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষ হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তবে উত্তরাপথের সঙ্গে দক্ষিণাপথের এ বিষয়েও একটু প্রভেদ আছে। তোমরা বোধহয় গ্লোবে লক্ষ্য করেছ যে পিপের গায়ে লোহার পৎরার বাঁধনের মত কতকগুলি কালো কালো রেখা এই গোলকটির দেহ বেষ্টন করে আছে। এই রেখাগুলির ভিতর দুটি রেখার একটু বিশেষত্ব আছে। সে দুটি একটানা নয়, কাটা কাটা। এ উভয়ের মধ্যে Equator-এর উত্তরে যে রেখাটি আছে, সেটির নাম Tropic of Cancer ; আর Equator-এর দক্ষিণে যেটি আছে, তার নাম Tropic of Capricorn.

সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর কি যোগাযোগ আছে, তাই দেখাবার জন্য এ দুটি রেখা আঁকা হয়েছে। এই রেখাঙ্কিত জায়গাতেই সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর উপর ঠিক খাড়া হয়ে পড়ে—অপর সব স্থানে তের্‌চা ভাবে। এই Tropic of Cancer-এর উত্তর দেশ শীতের দেশ, আর Tropic of Capricorn-এর দক্ষিণদেশও শীতের দেশ।

আর এই রেখাদ্বয়ের মধ্যের দেশ সব দারুণ গরম দেশ। ভারতবর্ষের উত্তরাপথ প্রায় সমস্তটাই Tropic of Cancer-এর উত্তরে, ও দক্ষিণাপথ আগাগোড়া তার নীচে। ফলে দক্ষিণাপথে শীত ঋতু বলে কোনও ঋতু

নেই। জনৈক ইংরাজ বলেছেন যে, দক্ষিণাপথ হচ্ছে Nine months hot and three months hotter। কথাটা Kipling-এর মুখ থেকে বেরলেও মিথ্যে নয়। উত্তরাপথে কিন্তু শীতগ্রীষ্ম দুই বেশি। দক্ষিণাপথে গ্রীষ্মকালে গরম যে উত্তরাপথের মত অসহ্য হয় না, তার কারণ দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে প্রথমত উঁচু, দ্বিতীয়তঃ তার তিনদিক সমুদ্রে ঘেরা।

মাটি

(১)

তারপর ভারতবর্ষের এ দুই ভূভাগের মাটিও এক জাতের নয়, এবং তাদের গুণাগুণও পৃথক্। মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কারবার প্রধানতঃ মাটি নিয়ে। গাছপালা তৃণ শস্য সব মাটিতেই জন্মায়। এবং অনেক পণ্ডিতের মতে সব জীবজন্তুর ন্যায় মানুষের আদি মাতা হচ্ছে ভূমি। এ মতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা কোন্ জমিতে কে জন্মেছে তার থেকেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব নির্ণয় করেন।

এ সত্ত্বেও আমাদের জানা উচিত যে, মাটি হচ্ছে পৃথিবীর চামড়া মাত্র। ও চামড়ার নীচে পাথর আছে, যে পাথর থেকে কিছুই জন্মায় না,—জীবজন্তুও নয়, গাছপালাও নয়। মা বসুন্ধরা আসলে পাষাণী।

এই মাটিও পাথরের বিকার মাত্র। অর্থাৎ হয় পাথরকে পুড়িয়ে না হয় গলিয়ে মাটি তৈরী করতে হয়। জলের কাজ হচ্ছে পাথরকে চূর্ণ করা, ও অগ্নির কাজ হচ্ছে তাকে দ্রব করা।

নদ নদী পাহাড় থেকে বেরয়, পাহাড় ভেঙে। আর তারা যে চূর্ণ পাষাণ বয়ে নিয়ে আসে, তাই দিয়ে যে মাটি গড়ে, সেই মাটিকে আমরা

পলিমাটি বলি। সেই মাটিই প্রধানতঃ গাছপালার জন্মভূমি। আর সমগ্র উত্তরাপথ প্রায় এই মাটিতেই তৈরী।

আমরা ভারতবর্ষকে উপদ্বীপ, Peninsula বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ত্রিকোণ দক্ষিণাংশই একটি উপদ্বীপ। এ অংশ অতি পুরাকালে একটি দ্বীপ মাত্র ছিল। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যের দেশ তখন জলমগ্ন ছিল। তারপর সেই জলমগ্ন দেশ যখন হিমালয়ের নদ-নদীর কৃপায় উত্তরাপথ হয়ে উঠল, তখন তার দক্ষিণ দ্বীপ উত্তরাপথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ সৃষ্টি করলে। দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে ঢের প্রাচীন দেশ। তোমরা যখন Geology পড়্বে, তখন এ দেশের বয়সের গাছপাথরের অথবা গাছপাথরের বয়েসের হিসেব পাবে।

(২)

দক্ষিণাপথের বেশির ভাগ মাটি পলিমাটি নয়, অর্থাৎ নদ-নদীর দান নয়; সে মাটি চূর্ণ পাথর নয়, গলা পাথর। আগ্নেয়গিরি হতে এ মাটি বহির্গত হয়েছে। আগ্নেয়গিরি হতে যে গলা পাথরের (lava) উদ্গম হয়েছে, তাই হচ্ছে দক্ষিণাপথের মাটি। উত্তরাপথ বরুণ দেবতার সৃষ্টি, দক্ষিণাপথ অগ্নিদেবতার। এ দুই মাটি এক জাতেরও নয়, এবং এ দুয়ের ধর্ম্মও এক নয়।

এ দুই দেশের জলবায়ুও বিভিন্ন। মেঘ আসে সমুদ্র থেকে, আর পবনদেবই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে আসেন। সুতরাং কোন দেশে কত বৃষ্টি হয় তা নির্ভর করে কোন দেশে, কোন দিক্ থেকে কি বাতাস বয়, তার উপর। তোমাদের পূর্ব্বে বলেছি যে, সিন্ধুদেশ হচ্ছে অনাবৃষ্টির ও

আসাম অতিবৃষ্টির দেশ। এর মধ্যবর্ত্তী দেশ অল্পবৃষ্টির দেশ। অপর পক্ষে দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূল অতিবৃষ্টির দেশ, ও তার পূর্ব্ব অংশই অনাবৃষ্টির দেশ।

যে বায়ুকে আমরা monsoon নামে আখ্যাত করি, তার চলবার পথ হচ্ছে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে। এ বাতাস প্রথমে মালাবার দেশকে জলে ভাসিয়ে দেয়, তারপর পশ্চিম ঘাটে বাধা পেয়ে ঘুরে এসে বাঙলায় ঢোকে, তখন তার গতি হয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে। এই বাতাস বাঙলা ও আসামের গায়ে প্রচুর জল ঢেলে দিয়ে তারপর উত্তরাপথের অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানেই এ দেশে বর্ষা ঋতু দেখা দেয়। Monsoon কিন্তু পঞ্চনদ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠতে পারে না। এ জন্য বাঙলায় যখন বৃষ্টি হয়, পাঞ্জাব তখন শুখনো। পাঞ্জাবে শীতকালই বর্ষাকাল।

(৩)

ভারতবর্ষের লোক শতকরা ৯০ জন হচ্ছে কৃষিজীবি। এই কারণে ভারতবর্ষ নাগরিক দেশ নয়, গ্রাম্য দেশ। এ দেশে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রাম আছে, আর পঁচাত্তরটিও নগর নেই। নগরেও একরকম সভ্যতার সৃষ্টি হয়, যেমন হয়েছিল পুরাকালের গ্রীসের আথেন্স্ ও ইতালির রোম নগরীতে। আর সেই সভ্যতাই কতক অংশে বর্ত্তমান ইউরোপের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। এই সহুরে মনোভাব থেকে নিস্কৃতি না পেলে মানুষের মন ভারতবর্ষ ও চীন দেশের সভ্যতার প্রতি অনুকূল হয় না। এই কারণেই ইউরোপের সাধারণ লোক ও বর্ত্তমান

ভারতবর্ষের অসাধারণ লোকে—অর্থাৎ যারা শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বিলেতের সাধারণ লোকের সামিল হয়ে গিয়েছে,—তারা ভারতবর্ষের সভ্যতাকে অসভ্যতা মনে করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা জন্ম লাভ করেছে সহরে ও সেইখানেই লালিত পালিত হয়েছে; অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে বনে, অর্থাৎ ঋষির আশ্রমে, ও সেইখানেই লালিত পালিত হয়েছে।

এ দেশ যদি ঋষিক্ষেত্র হয়, তার কারণ এ দেশ মূলে কৃষিক্ষেত্র। বন গ্রামেরই অপর পৃষ্ঠা। আশ্রম মাটির নয়, মনেরই কৃষিক্ষেত্র।

আজকাল অনেক ইংরাজীশিক্ষিত সদাশয় লোক village organisation করবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মানুষ কৃষিকর্ম্মের জন্য যুগ যুগ ধরে যে organisation করেছে, তারই নাম কি village নয়? Village জিনিষটে সুধু organised নয়, কালবশে প্রতি গ্রাম এক একটি organism হয়ে উঠেছে। Organism কে organise করবার প্রবৃত্তিটি যেমন উচ্চ তেমনি নিরর্থক। Organismsও ব্যাধিগ্রস্ত হয়; যদি আমাদের দেশের গ্রামসমূহ তাই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের ব্যাধিমুক্ত করবার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু চিকিৎসার নাম organisation নয়; organise মানুষে করে শুধু কল-কারখানা। যে ভূভাগকে ভগবান চাষের দেশ করে গড়েছেন, তাকে আমরা পাঁচজনে কল-কারখানার দেশ তৈরী করতে পারব না,—তা চাষার মুখের গ্রাস কেড়ে টাটা কোম্পানীর লোহার কলের পেট যতই ভরাই নে কেন। ভারতবর্ষ কখন বিলেত হবে না। মনে ভেবো

না যে আমি ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাইতে স্থরু করেছি। পুরাণকাররা বলেছেন যে ভারতবর্ষ হচ্ছে আসলে কর্ম্মভূমি, আর এ দেশ সেই কর্ম্মের ভূমি, যে কর্ম্ম দেব-দানবরা কর্‌তে পারেন না। এ কর্ম্ম হচ্ছে কৃষিকর্ম্ম। আর এইটিই হচ্ছে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির গোড়ার কথা আর অন্তরের কথা। আর এই ভিত্তির উপরেই ভারতবাসীর মনপ্রাণ গড়ে উঠেছে। এ সত্য উপেক্ষা করলে সেকালের ধর্ম্মশাস্ত্রেও অধিকার জন্মাবে না, একালের অর্থশাস্ত্রেও অধিকার জন্মাবে না।—আর তখন তোমরা ধর্ম্ম বলতে বুঝবে অর্থ, আর অর্থ বলতে বুঝবে ধর্ম্ম; যেমন আজকালকার পলিটিসিয়ানরা বোঝেন।

উদ্ভিদ

(১)

মানুষের জীবন উদ্ভিদের জীবনের অধীন। উদ্ভিদের কাছ থেকে যে আমরা স্থধু অন্ন পাই তাই নয়, বস্ত্রও পাই। ভারতবর্ষের বৃক্ষলতা তৃণশস্য আমাদের এই দুই জিনিষই যোগায়। উত্তরাপথ প্রধানতঃ আমাদের দেয় অন্ন, আর দক্ষিণাপথ বস্ত্র।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ রুটির দেশ, পূর্ব্বাংশ ভাতের দেশ। প্রথমতঃ ধান জন্মায় অতিবৃষ্টির দেশে, ও গম জন্মায় অল্পবৃষ্টি এমন কি অনাবৃষ্টির দেশে। তারপর ধানের জন্য চাই নরম মাটি, ও গমের জন্য শক্ত মাটি। বাঙলার মাটিও নরম আর এখানে বৃষ্টিও হয় বেশি, তাই বাঙলা হচ্ছে আসলে ধানের দেশ। পঞ্জাবে বৃষ্টি কম ও মাটি শক্ত, তাই পাঞ্জাবের প্রধান ফসল হচ্ছে গম। সিন্ধুদেশেও আজকাল দেদার গম জন্মাচ্ছে। অনেক

উদ্ভিদের মাথায়ও জল ঢালতে হয়, গোড়ায়ও জল দিতে হয়। ধান বৃষ্টির জলে স্নান না করতে পেলে বাঁচে না। কিন্তু খেজুর গাছের মাথায় এক ফোঁটাও জল দিতে হয় না। গোড়ায় রস পেলে ও গাছ তেড়ে বেড়ে ওঠে। এ কারণ সাহারা মরুভূমি ও আরবদেশই আসলে খেজুরের দেশ। ও দুই মরুভূমির ভিতরে যেখানে একটু জল আছে, সেইখানেই চমৎকার খেজুর জন্মায়। জানোয়ারের ভিতর যেমন উট, গাছের ভিতর তেমনি খেজুর—মরুভূমিরই জীব। গমের মাথায়ও বারিবর্ষণ করবার দরকার নেই। মরুভূমির ভিতর নালা কেটে যদি জল নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেই সেখানে গম জন্মায়, ও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শস্যের যে শুধু পিপাসা আছে তাই নয়, ক্ষিধেও আছে। মাটির ভিতর যে রাসায়নিক পদার্থ ওরফে সার থাকে, তাই হচ্ছে শস্যের প্রধান খাদ্য। যে দেশে বেশি বৃষ্টি হয়, সে দেশের মাটি থেকে এই সার ধুয়ে যায়। মরুভূমির অন্তরে কিন্তু এ সার সঞ্চিত থাকে। সেখানে অভাব শুধু জলের। তাই মরুভূমির অন্তরে জল ঢোকাতে পারলেই যে সব শস্যের শুধু গোড়ায় জল চাই, সে সব শস্য প্রভূত পরিমাণে জন্মায়। সিন্ধুনদ থেকে খাল কেটে জল নিয়ে গিয়ে সিন্ধু দেশকে এখন শস্য-শ্যামলা করে তোলা হয়েছে।

(২)

দক্ষিণাপথের ভিতরকার মাটি পলিমাটি নয়, আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত পাথর-গলা মাটি। এ মাটিতে খাবার জিনিষ তেমন জন্মায় না, আর দক্ষিণাপথের অপর মাটিও অতি নিরেস মাটি, তাতে ধান জন্মায়

না, গমও জন্মায় না; জন্মায় শুধু বাজরি আর জোয়ারি, আর তারি রুটি খেয়েই এ দেশের লোক জীবন ধারণ করে। এ দু ভাগের দুটি অংশ কিন্তু খুব উর্ব্বর, পশ্চিমে মালাবার ও পূর্ব্বে করমণ্ডল উপকূল। মালাবার নারিকেল গাছের দেশ, আর করমণ্ডল তাল গাছের। তা ছাড়া *এই দেশে শস্যও প্রচুর জন্মায়। তবুও দক্ষিণাপথ নিজের দেশেরই খোরাক জুগিয়ে উঠতে পারে না; দেশে বিদেশে অন্ন বিতরণ* করা ত তার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু এই দক্ষিণাপথের আর একটি সম্পদ আছে। আগ্নেয়গিরির পাথর-গলা মাটিকে Black cotton soil বলা হয়, কারণ ও মাটির রং কালো ও তাতে কাপাস জন্মায়। এদেশে এত কাপাস জন্মায় যে, দক্ষিণাপথ শুধু সমগ্র ভারতবর্ষকে নয়, দেশ বিদেশকে তুলো যোগায়। বাঙলা যেমন ধানের দেশ, পঞ্জাব যেমন গমের দেশ, দক্ষিণাপথ তেমনি মুখ্যত তুলোর দেশ। এ দেশ স্থধু কাপাসের দেশ নয়, শিমুলেরও দেশ। "অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু"—এ কথাটা স্থধু গল্পের কথা নয়। দক্ষিণাপথের তুল্য বিশাল শাল্মলী তরু পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

এই থেকে দেখতে পাচ্ছ যে ভারতবর্ষ, কি অন্ন কি বস্ত্র, কিছুরই জন্য অপর কোনও দেশের মুখাপেক্ষী নয়। আজকাল কেউ কেউ বাঙলা দেশে কাপাসের চাষ করতে চান। এ চেষ্টা দক্ষিণাপথে ধানের চাষ চালাবার অনুরূপ। এ ইচ্ছা অবশ্য অতি সদিচ্ছা, কিন্তু এ ইচ্ছা জিওগ্রাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সমগ্র ভারতবর্ষকে ঢেলে সাজবার মহৎ বাধা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রকৃতি।

ভারতবর্ষের ঐক্য

(১)

ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির পরিচয় দিতে হলে বোধহয় এক বৎসর কাল লাগে। আমি আমার বরাদ্দ এক ঘণ্টার ভিতর সে দেশের আকৃতি ও প্রকৃতির মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। (তাতে তোমাদের তরুণ জ্ঞানপিপাসা কতদূর মিটেছে বলতে পারিনে। যদি না মিটে থাকে ত আমার বক্তব্য এই যে—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।)

এখন এই কথাটি তোমাদের বলতে চাই যে, এই সমগ্র দেশটি এক দেশ। পৃথিবীতে আর যে-সব দেশ এক দেশ বলে গণ্য, সে-সব ছোট ছোট দেশ। এক মহাচীন ব্যতীত অপর কোথাও এত বড় দেশ এক দেশ বলে গণ্য হয়নি।

প্রথমত এ দেশের চতুঃসীমা এ দেশকে যেমন পরিচ্ছিন্ন করেছে, অন্য কোনও দেশকে তেমন করেনি। চীন দেশে এর তুল্য স্বাভাবিক সীমানা নেই, তাই চীনেরা তাদের দেশ প্রাচীর দিয়ে ঘিরতে চেষ্টা করেছিল, পাশাপাশি অন্যান্য দেশ থেকে স্বদেশকে পৃথক করবার জন্য। এ চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

হিমালয়ই হচ্ছে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির সব চাইতে বড় জিনিষ। পৃথিবীর আর কোনও দেশের অত বড় প্রাচীর নেই। তারপর ঐ হিমালয়ই সত্য সত্য ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা ও জলবায়ুর নিয়ন্তা। হিমালয়ের জলই হচ্ছে উত্তরাপথের প্রাণ। আর হিমালয়ই সমগ্র

ভারতবর্ষের বায়ুর চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। এর ফলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ এমন উর্ব্বর, এমন মানুষের বাসোপযোগী দেশ হয়েছে। তারপর ভারতবর্ষের অন্তরে কোনও সমুদ্র কিম্বা হ্রদ নেই, আর তার মধ্যস্থ একমাত্র পর্ব্বতশ্রেণী বিন্ধ্যশ্রেণী এত উচ্চ নয় যে, ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে। তারপর এই এক দেশ এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, এক হিসেবে একে পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত সার বলা যেতে পারে।

(২)

ভারতবর্ষ মহাদেশটি অতি সুরক্ষিত দেশ। প্রকৃতি নিজ হাতেই এ দুর্গের পর্ব্বতের প্রাকার ও সাগরের পরিখা গড়ে দিয়েছেন। তবে এ দেশ এসিয়ার অপরাপর দেশ হতে বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের সঙ্গে একেবারে যোগাযোগশূন্য নয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে উত্তরাপথের পশ্চিমে দুটি প্রবেশদ্বার আছে—উত্তরে Khyber pass ও দক্ষিণে Bolan pass. অতীতে এই দুই রন্ধ্র দিয়ে ইরাণী তুরাণী শক হুন যবন বাহ্লিক মোগল পাঠান প্রভৃতি জাতিরা এদেশে প্রবেশ করেছে—কিন্তু সহজে নয়। Khyber pass দিয়ে ঢুকলে পাঞ্জাবের পঞ্চনদ পার হয়ে এসে গঙ্গা-যমুনার দেশে পৌঁছতে হত, আর Bolan pass দিয়ে এলে বিদেশীদের বুকে মরুভূমি ঠেকৃত।

ভারতবর্ষের অন্তরে প্রবেশ করবার আসল দ্বার হচ্ছে দিল্লি নামক সহর; কারণ সেখানে মরুভূমি ও আরাবলি পর্ব্বত শেষ হয়ে শস্য-শ্যামল সমভূমি আরম্ভ হয়েছে। সেই মিলনস্থানেই মোগল-পাঠানরা দিল্লি নগর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর্য্যদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরও এইখানেই প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। আর দিল্লির উপকণ্ঠেই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রণক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পাণিপথ এ সবই প্রায় এক জায়গায়। পুরাকালে দিল্লির গেট্ না ভেঙ্গে কোনও বিদেশী জাতি ভারতবর্ষের ভিতর প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে যে-সকল জাত ও-দ্বার খুলতে পারেনি, তারা হয় দেশে ফিরে গিয়েছে, নয় সিন্ধু ও পঞ্চনদ দেশ অধিকার করে বসেছে।

ভারতবর্ষের সমুদ্রকূলেও দু'চারটি ছাড়া আর প্রবেশদ্বার ছিল না, আর সে-ক'টি বন্দর দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূলে; উপরে ভৃগুকচ্ছ ও সুরপারগ এবং নীচে কালিকট ও কোচিন।

এই ক'টি দ্বার দিয়েই ইউরোপীয় জাতিরা জাহাজে করে সমুদ্র পার হয়ে এদেশে প্রবেশ করেছে। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসীরা এই পথ দিয়েই ভারতবর্ষে ঢুকেছে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার স্থলপথ এখন বন্ধ। Khyber pass এবং Bolan pass এই দুই দুয়োরই এখন দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত; কিন্তু জলপথ এখন পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তিন দিকে খোলা। এখন ভারতবর্ষের সঙ্গে এসিয়ার যোগ ছিন্ন হয়েছে, তার পরিবর্ত্তে নূতন যোগ স্থাপিত হয়েছে ইউরোপের সঙ্গে; সে যোগ অবশ্য দৈহিক নয়, মানসিক।

(৩)

এই এক ঘণ্টা ধরে তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের যে মোটামুটি বর্ণনা করলুম, সে বর্ণনার ভিতর থেকে তার একটা অঙ্গ বাদ পড়ে গেল। দেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ভারতবাসীদের কথা বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ হয়না। তবে যে

ভারতবর্ষের নানা দেশের নানা জাতীয় লোকের রূপগুণের পরিচয় দিতে চেষ্টামাত্র করিনি, তার কারণ সে পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। Anthropology নামক বিজ্ঞান আমি জানিনে, আর সে বিজ্ঞানেরও এ বিষয়ে বিশেষ কোনও জ্ঞান নেই। Anthropology এ বিষয়ে সত্য খুঁজ্‌ছে, কিন্তু আজও তার সাক্ষাৎ পায়নি। আজ এক ওanthropologist যা বলেন, কাল অপর anthropologist তার খণ্ডন করেন। সুতরাং ও-শাস্ত্রের মনগড়া কথা সব তোমাদের শুনিয়ে কোনও লাভ নেই; বরং সে সব কথা শোনায় তোমাদের ক্ষতি আছে। বিজ্ঞানের নাম শুনলেই আমরা অজ্ঞান হই। অর্থাৎ ঐ নামে যে-সব-কথা চলে, সে-সব কথাকে এ যুগে বেদবাক্য বলে মেনে নিই। আমাদের মত বয়স্ক লোকদেরই যখন মনের চরিত্র এ-হেন, তখন তোমাদের পক্ষে এ-সব অনিশ্চিত বিজ্ঞানের সুনিশ্চিত কথা শোনায় ভয়ের কারণ আছে। তোমাদের মন স্বভাবতঃই বিশ্বাসপ্রবণ। বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দেও, খবরের কাগজের কথাতেও তোমরা বিশ্বাস করো। বুজ্‌রুক শব্দটার মানে শুনতে পাই জ্ঞানী। বুজ্‌রুক নামক জ্ঞান নিয়েই কাগজওয়ালাদের কারবার। আর নিত্য দেখতে পাই যে, সেই সব বুজরুকী কথা তোমাদের নরম মনে এমনি বসে যায় যে, সে কালির ছাপ অনেকের মনে চিরজীবন থেকে যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ব অথবা জাতিতত্ত্ব নিয়ে তোমাদের সুস্থ মনকে ব্যস্ত করবার কোনও প্রয়োজন নেই।

ভারতবর্ষের সকল লোক যে এক জাতির লোক নয়, এ সত্য ত সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ। এ দেশে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের রূপের

ও বর্ণের ভিতর কতটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেরই চোখে পড়ে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাদের প্রকৃতিও বিভিন্ন। আমি পূর্ব্বে তোমাদের বলেছি যে, পৃথিবীর জিওগ্রাফিকাল ভাগ ও পলিটিকাল ভাগ এক নয়। এ দেশের লোক পলিটিকাল হিসেবে এক জাত হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে এক জাত নয়। জিওগ্রাফির ভাগের হিসেবে তাদের জাতেরও স্পষ্ট ভাগ আছে। পলিটিক্সের হিসেবে কাশ্মীরী পণ্ডিত অবশ্য তামিল নাইডুর সহোদর, কিন্তু জিওগ্রাফির হিসেবে এঁরা পরস্পরকে কিছুতেই দেশকা ভাই বলতে পারেন না। আজ আমি তোমাদের কাছে যতদূর সংক্ষেপে পারি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান জিওগ্রাফির বর্ণনা করলুম; বারান্তরে তোমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন জিওগ্রাফি ও প্রাচীন ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির কথা শোনাব। পুরাকালেও স্বদেশের জিওগ্রাফি জানবার কৌতূহল লোকের ছিল, এবং এ বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন তা তাঁরা লিখে রেখে গিয়েছেন; আর তার থেকেই জানা যায় যে, কালক্রমে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

তোমাদের ভরসা দিচ্ছি যে, সে বর্ণনা এ বর্ণনার চাইতে ঢের ছোট হবে, আর আশা করি ঢের বেশী সরস হবে। যে সব দেশের, যে সব সহরের, যে সব পাহাড়ের, যে সব নদীর নাম আমরা রামায়ণ মহাভারতে পড়ি, তারা কোথায় ছিল আর তাদের ভিতর কোনটি স্বনামে না হোক, স্বরূপে বিরাজ করছে, সে সব কথা শুনতে তোমাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সেকালের ভারতের পরিচয় দিতে আমাকে, কষ্ট করতে হবে, কিন্তু শুনতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না।

অনু-হিন্দুস্থান *

হে সমিতির কুমারগণ!

আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুস্থানের বাইরে হিন্দুর আর স্থান নেই। এ বিশ্বাস সর্ব্বসাধারণ;—শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলেরই ধারণা যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি আছে শুধু জিওগ্রাফিতে যাকে বলে ভারতবর্ষ, তারই চতুঃসীমার মধ্যে।

আমরা সকলেই দেখতে পাই—ভারতবর্ষের পশ্চিমে রয়েছে মুসলমান, উত্তরেও তাই, পূর্ব্বে বৌদ্ধ আর দক্ষিণে সমুদ্র। আর সমুদ্রের ওপারে যদি কোনও দেশ থাকে ত সে দেশে হিন্দুজাত কখনও যায়নি; আর যদি কখন গিয়ে থাকে ত তখনি তাদের হিন্দুত্ব মারা গিয়েছে। কেননা একালে হিন্দুজাতির সমুদ্রযাত্রার অর্থ—তার গঙ্গাযাত্রা।

এ ধারণা শিক্ষিত-লোক-সামান্য হলেও, অশিক্ষিত ধারণা। ইংরাজী শিক্ষার চশ্‌মা পরলে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় দৈন্য ও হীনতা সম্বন্ধে আমাদের চোখ যেমন ফোটে, আমাদের জাতীয় পূর্ব্বগৌরব ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে আমরা তেমনি অন্ধ হই। আমাদের নূতন শিক্ষা এসেছে পশ্চিম থেকে। এর ফলে আমরা পূর্ব্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ,—পূর্ব্ব কাল সম্বন্ধেও, পূর্ব্ব দিক সম্বন্ধেও। ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালের হিষ্টরির সঙ্গে আমাদের যদি কিছুমাত্র পরিচয় থাকৃত, তাহলে আমরা জানতুম যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বের

* কোন পারিবারিক সমিতিতে পঠিত।

অনেক দেশেও অনেককাল ধরে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি রাজত্ব করেছে। আজকাল অনেকে যাকে ভারতবর্ষের অতীত বলে চালিয়ে দিতে চান, তা কোন দেশেরই অতীত নয়—ভারতবর্ষের ত নয়ই। বেশির ভাগ লোকের মতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যেমন ইউরোপের বর্ত্তমান, জনকতক লোকের মতে ভারতবর্ষের অতীতও তেমনি ইউরোপের বর্ত্তমান। আমাদের কল্পনার দৌড়ও বিলেত পর্য্যন্ত।

আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেন লোকের নাম থেকে দেশের নাম হয়. দেশের নাম থেকে লোকের নাম হয় না। যথা :—আর্য্যরা বাস করতেন বলেই আধখানা ভারতবর্ষের নাম হয়েছিল আর্য্যাবর্ত্ত, আর আর্য্যরা যদি অপর কোন দেশে গিয়ে বাস করেন, তাহলে সে দেশের নামও হবে আর্য্যাবর্ত্ত। এই হিসেবে ভারতবর্ষ ও চীনের ভিতর যে-সব দেশ আছে, সে-সব ভূভাগকে উপ-হিন্দুস্থান বলা অন্যায় নয়। যাক্ সে সব পুরোনো কথা। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, আজও এসিয়ার এক কোণে এমন একটি দেশ আছে, যেথানকার ষোল-আনা অধিবাসী আজও হিন্দু। সেই দেশটির সঙ্গে তোমাদের চেনাপরিচয় করিয়ে দিতে চাই। সে পরিচয় করিয়ে দিতে বেশিক্ষণ লাগবে না। মাপে ও ম্যাপে ভারতবর্ষ যেমন বড়, সে দেশটি তেমনি ছোট। ভারতবর্ষের তুলনায় সেটি তালের তুলনায় তিল যদ্রূপ, তদ্রূপ। এমন কি মানচিত্রেও সে দেশটি হঠাৎ কারো চোখে পড়ে না ; অনেক খুঁজেপেতে সেটিকে বার করতে হয়। সেকালের উপ-হিন্দুস্থানের দক্ষিণে ম্যাপের গায়ে যে কতকগুলো কালির ছিটে ফোঁটা দেখা যায়, তারই এক বিন্দু হচ্ছে এই বর্ত্তমান অনু-হিন্দুস্থান।

ও-দেশের হিষ্টরি তোমরা না জানো, তার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ! এর নাম বলীদ্বীপ এবং এটি হচ্ছে যবদ্বীপ থেকে ভাঙা এক টুকরো খণ্ডদ্বীপ। ম্যাপে দেখতে পাওয়া যায় যে, জাভা সমুদ্রের মধ্যে, পশ্চিমে মাথা করে পূর্ব্বে পা-ছড়িয়ে, অনন্ত শয্যায় শুয়ে রয়েছে। আর তার পায়ের গোড়ায় পুঁটুলি পাকিয়ে জড়সড় হয়ে রয়েছে—বালী। এ দুটি দ্বীপকে যদি খাড়া করে তোলা যায়—অর্থাৎ তাদের মাথা যদি পশ্চিম থেকে উত্তরে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, আর পা পূর্ব্ব থেকে দক্ষিণে,—তাহলে ভারতবর্ষের নীচে লঙ্কা যেমন দেখায়, জাভার নীচে বালীও তেমনি দেখাবে। এ কথাটা এখানে বলে রাখছি এই জন্যে যে, সিংহলের পূর্ব্ব ইতিহাস যেমন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ইতিহাসের একটা ছেঁড়া পাতা মাত্র,—বালীর ইতিহাসও তেমনি জাভার ইতিহাসের একটি ছিন্ন পত্র।

জাভা ও বালীর মধ্যে যে সমুদ্রের ব্যবধান আছে, সে অতি সামান্য। সে শাখা-সমুদ্রটুকু মাইল দেড়েকের বেশি চওড়া নয়, অর্থাৎ চাঁদপুরের নীচে মেঘনার তুল্য। বলীদ্বীপ কতটা লম্বা আর কতটা চওড়া তা শুন্‌লে তোমরা হাসবে। বালী দৈর্ঘ্যে ৯৩ মাইল ও প্রস্থে মোটে ৫০ মাইল; তাও আবার সমস্তটা সমতল ভূমি নয়। এই ছোট্ট দেশের মধ্যে বহুসংখ্যক হ্রদ আছে, আর সে সব হ্রদ এত গভীর যে, তাদের অতলস্পর্শী বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। তার উপর একটি একটানা পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা দেশটি দু' ভাগে বিভক্ত। দেশ ছোট, কিন্তু তার পর্ব্বত যেমন লম্বা তেমনি উঁচু; অর্থাৎ ও হচ্ছে একরকম বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। সে পর্ব্বতের উচ্চতা কোথায়ও সাড়ে তিন হাজার ফিটের কম নয়, কোথাও বা তা দশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত মাথা তুলেছে। এ পর্ব্বত

বালী দেশকে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথে ভাগ করেছে—ভারতবর্ষের নকলে।

তোমরা হয়ত মনে ভাব্‌বে যে, এই দেশেরই ইংরাজী নাম হচ্ছে Lilliput. কিন্তু তা নয়। Gulliver Lilliput দেশের লোকের যে বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে বালীর অধিবাসীর চেহারার কোনও মিল নেই। এরা আকারে জাভার লোকের চাইতে ঢের বেশি দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ। দেশ ছোট হলে সেখানকার মানুষ যে বড় হয়, তা অন্যত্রও দেখা যায়। ইউরোপের ভিতর ইংলণ্ড, সব চাইতে ছোট দেশ ; কিন্তু এদেশের মত বড়লোক ও-ভূভাগে অন্য কুত্রাপি মেলে না। অপর পক্ষে অতি ক্ষুদ্র লোকের সাক্ষাৎ শুধু মহাদেশেই মেলে। বামনের জাত শুধু আফ্রিকাতেই আছে। Gulliver বলীদ্বীপে না গেলেও, সিন্ধুবাদ যে সে দেশে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ, যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার স্কন্ধে ভর করেছিলেন, তিনি ছিলেন বলীয়ান।

বালীর লোক শুধু বলিষ্ঠ নয়, অত্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠ। চাষবাসে তারা অতিশয় দক্ষ। তারা হল-চালনা ছাড়া হাতের আরও অনেক কাজ করে। তারা চমৎকার কাপড় বোনে ও চমৎকার অস্ত্র বানায়। তাদের তুল্য তাঁতি ও কামার জাভায় পাওয়া যায় না। অন্নবস্ত্র ও অস্ত্রের সংস্থান যে দেশে আছে, সে দেশে একালের আদর্শ সভ্যতার কোন্ উপকরণ নেই? আর সৌখীন অশনবসনের ব্যবস্থাতেও বালী বঞ্চিত নয়। সেদেশে কফি জন্মায় আর তামাক জন্মায়। আর এ দুই তারা পান করে ; একটা তাতিয়ে জল করে, আর একটা পুড়িয়ে ধোঁয়া করে—যেমন আমরা করি। বালীর লোক রেশমের কাপড়ও বোনে, আর তা রঙাবার জন্য

নীলের চাষও করে। সোনা দিয়ে তারা গহনা গড়ায় ও জরি বানায়। গহনা গড়তে ও জরির কাজ করতে তারা অদ্বিতীয় ওস্তাদ।

বালীর ভাষা জাভার ভাষারই অনুরূপ। তবে ইতালীর ভাষার সঙ্গে ফরাসী ভাষার যে প্রভেদ, যবীয় ভাষার সঙ্গে বলীয় ভাষার সেই প্রভেদ। এদেশের সাহিত্যের ভাষার নাম "কবি",—"সাধু" নয়। পাঁচশ' বৎসর পূর্ব্বে জাভার সাহিত্য "কবি" ভাষাতেই লেখা হত। এ ভাষার অনেক শব্দ সংস্কৃত। এ যুগে জাভার লোক, তাদের সাহিত্যের ভাষা বড় একটা বুঝতে পারে না—কিন্তু বালীর লোকের কাছে "কবি" মৃত নয়। চারশ' বৎসর আগে জাভার লোক সব মুসলমান হয়ে যায়। সম্ভবত সেইজন্য তারা তাদের পূর্ব্ব কবি-ভাষা ভুলে গিয়েছে; আর বালীর লোক আজও হিন্দু রয়েছে বলে "কবির" পঠনপাঠন সে দেশে আজও চল্‌ছে।

জাভার যথার্থ নাম যে যবদ্বীপ, তা তোমরা সবাই জানো। সংস্কৃত যব শব্দের অন্তস্থ 'য' আরব দেশের মুসলমানদের মুখে বর্গীয় জয়ে, ও ব' ভয়ে পরিণত হয়ে, তদুপরি অকার আকার হয়ে জাভা রূপ ধারণ করেছে।

এই সংস্কৃত নাম থেকেই আন্দাজ করা যায় যে, পুরাকালে ও-দ্বীপের নামকরণ করেছিল হিন্দুরা। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো, কবে হিন্দুরা এ দ্বীপ আবিষ্কার করে?—এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে যে কালে এদেশে রামায়ণ লেখা হয়, সে কালে যবদ্বীপ যে হিন্দুদের কাছে উক্ত নামেই পরিচিত ছিল, তার প্রমাণ রামায়ণেই আছে। আর সে বড় কম দিনের কথা নয়। তোমরা সবাই জানো যে, রামায়ণ রাম জন্মাবার ষাট হাজার বৎসর আগে লেখা হয়েছিল; আর রাম জন্মেছিলেন ত্রেতা যুগে।

শ্রীমৎ হনুমানকে যখন দেশদেশান্তরে সীতাকে অন্বেষণ করতে আদেশ দেওয়া হয়, তখন তাকে বলা হয়,—

“গিরিভির্যে চ গম্যন্তে প্লবনেন প্লবেন চ।
রত্নবন্তং যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্॥
সুবর্ণরূপ্যকং চৈব সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্।
যবদ্বীপমতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্ব্বতঃ।
দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গেন দেবদানবসেবিতঃ।

এ যবদ্বীপ যে বর্ত্তমান জাভা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা সেখানে যেতে হত প্লবনেন প্লবেন চ—অর্থাৎ হয় লাফিয়ে,নয় সাঁত্‌রে, নয় ভেলায় চড়ে। কিষ্কিন্ধা থেকে লঙ্কায় এক লম্ফে যাওয়া সোজা, কারণ এক লম্ফে তা যাওয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাজ থেকে বালী যেতে হলে অসম্ভব high jump ও long jump একসঙ্গে দুই চাই। আর বঙ্গ-উপসাগর ত British Channel নয় যে, সাঁত্‌রে পার হওয়া যায়। সুতরাং ও দেশে ভেলায় চড়েই যেতে হত। যবদ্বীপ রত্নবন্ত ও সোনারূপার দেশ, আর সোনার খনিতে মণ্ডিত। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, এ দেশ জাভা নয়, সুমাত্রা। কেননা সোনার খনি জাভায় নেই ও কোন কালে ছিল না,—ছিল ও আছে শুধু সুমাত্রায়। অপর আর এক দল বলেন যে, যবদ্বীপ জাভাই, সুমাত্রা নয়। কিন্তু আসল কথা এই যে, সেকালে হিন্দুদের কাছে জাভা ও সুমাত্রা উভয় দ্বীপই যবদ্বীপ বলে পরিচিত ছিল। সুমাত্রা পরে স্বর্ণদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতি নাম ধারণ করে। সুমাত্রা নাম পুরোনো নয়। স্বর্ণদ্বীপে সমুদ্র বলে একটি নগর

ছিল। সেই সমুদ্রই আরবী জবানে রূপান্তরিত হয়ে সুমাত্রা হয়েছে, এবং এই নতুন নামেই ও-দ্বীপ ইউরোপীয়দের কাছে পরিচিত আর একালের জিওগ্রাফিতে প্রসিদ্ধ।

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বলেন যে, প্রাচীন হিন্দুদের ভূগোলের জ্ঞানের দৌড় ঐ যবদ্বীপ পর্য্যন্ত ছিল। তার পূর্ব্বে যে আর কোন দেশ আছে, তা তাঁরা জানতেন না—তাই তাঁরা যবদ্বীপ অতিক্রম করে যে শিশির পর্ব্বতের উল্লেখ করেছেন, সে পর্ব্বত তাঁদের ষোল-আনা মনগড়া। আমি প্রথমত ইউরোপীয় নই, দ্বিতীয়ত পণ্ডিত নই ; সুতরাং তাঁদের কথা আমি নতমস্তকে মেনে নিতে বাধ্য নই।

যবদ্বীপ অতিক্রম করে যে দ্বীপটি পাওয়া যায়, তার নাম বলীদ্বীপ ; এবং তার অন্তরে যে পর্ব্বত আছে, সে পর্ব্বতকে শিশির বলা ছেরেফ কবিকল্পনা নয়। কেননা যার এক একটি শৃঙ্গ দশ হাজার ফিটের চাইতেও উঁচু, সে পর্ব্বতকে কিছুতেই গ্রীষ্মপর্ব্বত বলা যায় না—যদি কিছু বলতে হয় ত শিশির বলাই সঙ্গত। শুনতে পাই উক্ত দ্বীপপুঞ্জ চির-বসন্তের দেশ। সুতরাং সে দেশের পাহাড়ে শীত হবারই কথা। আর সে পর্ব্বত দেব-দানব সেবিত বলবার অর্থ—সেখানে মানুষের বসতি নেই। হনুমানকে সীতার খোঁজে আরও অনেক স্থানে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সে সব দেশ যে রূপকথার দেশ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে দেশে মানুষের কান হাতীর কানের মত বড় ; ও যে দেশে মানুষের কান উটের কানের মত ছোট ; আর যে দেশে মানুষের পা দুটো নয়, একটা মাত্র, অথচ সেই এক পায়ে তারা খুব ফুর্ত্তি করে চলে ; সে সব দেশেও হনুমানকে ভ্রাম্যমান্ হবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ সব দেশের

কোনও নাম বলা হয়নি। এর থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, যে-সব দেশের নাম হিন্দুরা জানত না, সেই সব দেশ সম্বন্ধে তাদের কল্পনা খেল্‌ত। যে দেশের নাম তারা জান্‌ত, সে দেশের রূপও তারা চিন্‌ত।

সে যাই হোক, বলীদ্বীপেরও নাম যখন সংস্কৃত, তখন সে নামকরণ যে হিন্দুরাই করেছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আর খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বেও যে হিন্দুরা বলীদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তারও কিছু কিঞ্চিৎ প্রমাণ আছে।

এই দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন হিন্দু জাতির ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। সে ইতিহাস আমি আজ তোমাদের শোনাব না; কারণ সে মস্ত লম্বা ইতিহাস। হিন্দুজাতির মহা গৌরবের কথা এই যে, হিন্দুরা এই দ্বীপবাসী অসভ্য জাতদের সভ্য করে তুলেছিলেন। এ দেশের লোক পূর্ব্বে যে কিরকম ঘোর অসভ্য ও ভীষণপ্রকৃতির লোক ছিল, তা রামায়ণে দ্বীপবাসীদের বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায়। তারা ছিল "আমমীনাশনাঃ" অর্থাৎ তারা কাঁচা মাছ খেত। তাতে কিছু যায় আসে না; কেননা সুসভ্য জাপানীরা আজও তাই খায়। বাল্মীকি শুনেছিলেন যে, তারা "অন্তর্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রাঃ"। নরশার্দ্দূল অবশ্য আমরা বীরপুরুষদেরই বলি, কিন্তু "নরব্যাঘ্র" বলতে বীরপুরুষ বোঝায় না, বোঝায় সেই জাতীয় পুরুষদের, যারা "অক্ষয়া বলবন্ত পুরুষা পুরুষাদকা"—ইংরাজীতে যাকে বলে Cannibals। এই হেমাঙ্গ কিরাতের দল ছিল সব ক্যালিবানের দাদা ক্যানিবল।

শ্রীবিজয় রাজ্যের অর্থাৎ সুমাত্রার ইতিহাস-লেখক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত বলেছেন যে,—

"আমরা পুরোনো দলিলপত্র থেকে প্রমাণ পেয়েছি যে, ভারত মহা-সাগরের দ্বীপপুঞ্জ পুরাকালে এক নব সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। যেমন 'কাম্বোজের' (Cambodia) ও 'চম্পার' (Cochin China), তেমনি এ দেশেরও Alma Mater ভারতবর্ষ বহুকাল পূর্ব্বে তার দেবতা, তার শিল্পকলা, তার ভাষা, তার সাহিত্য, সংক্ষেপে তার সভ্যতার সকল মহামূল্য উপকরণ এই দ্বীপবাসীদের সানন্দে দান করেছিল, এবং সহস্র বৎসরের অধিককাল ধরে এই দ্বীপবাসীরা সমগ্র হিন্দু-সভ্যতা ভক্তিভরে শিক্ষা ও আয়ত্ত করে তাদের হিন্দু-গুরুদের গৌরবান্বিত করেছিল।"

একটি সভ্য জাতি, একটি অসভ্য জাতিকে নিজের ধর্ম্ম, আর্ট ও সাহিত্যের চাইতে বড় আর কোন্ মহামূল্য বস্তু দান করতে পারে?

প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ই-চিং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশে ফেরবার পথে যবদ্বীপে কিছুকাল বাস করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখে গিয়েছেন যে, "যবদ্বীপের বৌদ্ধ-পণ্ডিতরা ভারতবর্ষের মধ্যদেশের পণ্ডিতদের মত সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চ্চা করেন, ও তাঁদের ক্রিয়া-কলাপ, আচার-বিচার, মধ্যদেশের ক্রিয়া-কলাপ, আচার-বিচারের সম্পূর্ণ অনুরূপ। সুতরাং ভবিষ্যতে চীন-পরিব্রাজকরা যেন প্রথমে যবদ্বীপে এসে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, পরে ভারতবর্ষে যান।" আমরা যেমন আগে গোলদিঘির পণ্ডিতদের কাছে ইংরাজী শিক্ষা করে পরে বিলেত যাই।

ই-চিংয়ের পরামর্শ অনুসারে তাঁর পরবর্ত্তী বহু চীনদেশীয় পরিব্রাজক সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা করবার জন্য যবদ্বীপে গিয়েছিলেন। এখানে একটি কথা বলে রাখি। যবদ্বীপে প্রথমতঃ হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, পরে সে

দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু যবদ্বীপে এ দুই ধর্ম্ম পৃথক ছিল-না, দুয়ে মিলে একই ধর্ম্ম হয়। বুদ্ধ সে দেশে শিববুদ্ধ নামেই পরিচিত। এ দেশে বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার হিসেবেই গণ্য; কিন্তু সে দেশে শিবে ও বুদ্ধে সমান হয়ে গিয়েছিল। সেকালে হিন্দুরা যে অপর দেশের লোককে সভ্য করেছিল, এ কথা বিশ্বাস করা দূরে থাক্, এ যুগের আমরা তা কল্পনাও করতে পারিনে; কারণ এখন অপর দেশের লোক আমাদের সভ্য করছে. আর তাদের সভ্যতা আমরা সকল তন, মন, ধন দিয়ে মুখস্থ করতে এতই ব্যস্ত যে, ভারতবর্ষ যে এককালে সভ্য ছিল, সে কথা আমাদের মনে স্থান পায় না,—পায় শুধু মুখে।

সুতরাং ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের লোক যবদ্বীপে গিয়ে বসতি করে, এ প্রশ্ন তোমাদের মনে উদয় হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রমাণের চাইতে অনুমানের উপর বেশি নির্ভর করতে হয়; অর্থাৎ অন্ধকারে ঢিল মারতে হয়। ঐতিহাসিকরা সে ঢিল দেদার মেরেছেন, কিন্তু তার একটাও যে ঠিক লোকের গায়ে গিয়ে পড়েছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

তবে এটুকু ভরসা করে বলা যায় যে, তারা আর যে জাতই হোক্, মাদ্রাজী নয়। যে উত্তরাপথের লোক দক্ষিণাপথকে সভ্য করেছে, খুব সম্ভবত তারাই ঐ দ্বীপবাসীদেরও সভ্য করেছে। যবদ্বীপে যে মহাভারতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা উত্তরাপথে যে মহাভারত প্রচলিত ছিল, তারই অনুবাদ।

কোথায় ভারতবর্ষের উত্তরাপথ আর কোথায় মহাসাগর! সুতরাং তাঁরা কোন্ বন্দর থেকে মহাসমুদ্রে অবতরণ করলেন? খুব সম্ভবত তাঁরা মসলিপত্তনে গিয়ে জাহাজে চড়েছিলেন। আর গুজরাটের Broach

নগর থেকে মসলিপত্তন পর্য্যন্ত যে একটি স্থলপথ ছিল, তারও প্রমাণ আছে। সুতরাং এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যরাই এই সভ্যতা প্রচারকার্য্যে ব্রতী হয়েছিলেন। মনু বলেছেন যে, আর্য্যদের আচারই একমাত্র সাধু আচার, অতএব তা "শিক্ষেরন্‌পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবা।" এ কথার ভিতর মস্ত একটা গর্ব্ব আছে, কিন্তু তার চাইতেও বেশি আছে—উদারতা আর মহত্ত্ব। দক্ষিণাপথের তামিলরাও সুমাত্রা জয় করতে গিয়েছিল, কিন্তু সে বহুকাল পরে—খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে। তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল শ্রীবিজয় রাজ্য বিজয় করে তাকে শ্রীভ্রষ্ট করা। বলীদ্বীপের কথা বলতে গিয়ে যবদ্বীপের বিষয় দু' কথা বললুম এই জন্য যে, সেকালের যবদ্বীপের হিন্দুধর্ম্ম একালে বলীদ্বীপে মজুত রয়েছে।

রামায়ণের যুগে যবদ্বীপ সপ্তরাজ্যে উপশোভিত ছিল; কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সে দেশে তিনটি মাত্র রাজ্য ছিল। আর তার শেষ রাজ্যের নাম ছিল মধ্য-পাহিত। মধ্য শব্দটি সংস্কৃত, ও পাহিত যবীয়। দু' ভাষায় মিশ্রিত এমন বর্ণসঙ্কর নাম সব দেশেই পাওয়া যায়। যে দেশে দুটি বিভিন্ন জাতি পাশাপাশি বাস করে, সে দেশের উভয় ভাষার এরকম দ্বন্দ্ব-সমাস নিত্যই ঘটে। যার জোর বেশি তার শব্দ আসে আগে, আর যে কমজোর তার শব্দ থাকে পিছনে পড়ে। যেমন আমাদের দেশে একটি পল্লীর নাম হয়েছে বারাকপুর। ইংরাজী barrack শব্দ এসেছে আগে, আর সংস্কৃত পুর শব্দ তার পিছনে লেজের মত ঝুলছে। মধ্য-পাহিত শব্দ এই জাতীয় দ্বন্দ্ব-সমাস।*

*ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বলেন, "মধ্যপাহিত" মানে তিতো বেল। এ অর্থ আমার মুখরোচক নয়।

"পাহিত" কথাটার মানে আমি জানি নে, কিন্তু তার অর্থ যে দেশ নয়—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ মধ্য-পাহিত যবদ্বীপের মধ্যদেশ নয়, সব চাইতে পূবের দেশ।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপের হিন্দু-রাজ্যের যখন ধ্বংস হয়, ও সে দেশের লোকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তখন একদল লোক স্বধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্য যবদ্বীপ থেকে পালিয়ে বলীদ্বীপে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদেরই বংশধরেরা এখন বালীর অধিবাসী। আর এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীরাই আজ পর্য্যন্ত তাদের স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্য দুই রক্ষা করে আসছে। হিন্দু হলেই পরাধীন হতে হবে, বিধির যে এমন কোন নিয়ম নেই, তার তিলমাত্র প্রমাণ ঐ দেশেই আছে। বলীদ্বীপ স্বাধীন, কিন্তু যে হিসাবে জাপান স্বাধীন সে হিসাবে নয়—যে হিসাবে নেপাল স্বাধীন সেই হিসাবে, এবং একই কারণে। হিন্দুস্থানের ইতিহাসের ধারা এই যে, সে দেশ প্রথমে মুসলমানের অধীন হয়, ও পরে খৃষ্টানের। নেপাল ও বালী আগে মুসলমানের অধীন হয়নি, কাজেই তা আজ খৃষ্টানের অধীন হয়নি।

বলীদ্বীপ একরত্তি দেশ হলেও, কোনও একটি রাজার রাজ্য নয় এই একশ' মাইল লম্বা ও পঞ্চাশ মাইল চওড়া দেশ অষ্ট রাজ্যে উপ-শোভিত। আর এই আটটি ভাগের আটটি পৃথক রাজা আছে। এর থেকেই বুঝতে পারছ, এ দেশে যা আছে তা পূরোমাত্রায় হিন্দু রাজ্য। ভারতবর্ষও হিন্দু-যুগে হাজার পৃথক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এদেশে যে দুজন একচ্ছত্র রাজত্ব করে গিয়েছেন, তাঁরা হিন্দু নন। অশোক ছিলেন বৌদ্ধ, আর আকবর মোগল। এক রাজ্যের প্রজা না হলে একদেশের লোক যে এক nation হতে পারে না, এ হচ্ছে ইউরোপের হাল মত। হিন্দুরা

প্রাচীন যুগে যদি এক নেশন হয়ে থাকে ত সে এক ধর্ম্মের বন্ধনে। অষ্ট রাজ্যে বিভক্ত হলেও বালীর অধিবাসীরা এক nation—এক ধর্ম্মাবলম্বী বলে। ইউরোপে একালে নেশান গড়ে রাজায়; আর এ দেশে সেকালে গড়ত দেবতায়। পশ্চিমের সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে রাজনীতি, আর পূর্ব্বের সব চাইতে বড় কথা ছিল ধর্ম্মনীতি।

যেমন রাজ্যের ব্যবস্থায়, তেমনি সমাজেও তারা পূরো হিন্দু। তারা এক জাতি হলেও পাঁচ জাতে বিভক্ত। এ পাঁচ জাত হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও চণ্ডাল। এ পাঁচ জাত পরস্পর বিবাহাদি করে-না। পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। গীতায় ভয় দেখিয়েছে যে, এ করলে ও হবে, ও হলে তা হবে, আর তা হলেই হবে বর্ণসঙ্কর, তার পরেই প্রলয়। বালীর হিন্দু-সমাজ বোধ হয় গীতার মতেই চলে। আর প্রাণদণ্ডটাও বোধ হয় দেওয়া হত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় অনুসারে। যদি কোনও ঘাতক কারও প্রাণ বধ করতে ইতস্ততঃ করত, তাহলে তাকে সম্ভবত বলা হত :—

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"

আমরা সকলেই যখন ব্রহ্ম তখন কে কাকে মারে, আর কেই বা মরে। কিন্তু এতটা নির্জ্জলা হিঁদুয়ানী এ যুগে চলে না। কারণ এ যুগের লোকের যখন তখন মরতে ঘোর আপত্তি আছে, কিন্তু যাকে তাকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই। তাই এখন নিয়ম হয়েছে যে, অসবর্ণ বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যার বর্ণ নিম্ন, অপর পক্ষও সেই বর্ণ ভুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ জাতিভেদের কাঠাম বজায় থাকবে, কিন্তু লোকের একবর্ণ

ত্যাগ করে আর এক বর্ণে ভর্ত্তি হবার স্বাধীনতাও থাকবে। স্কুলের ছেলেরা যেমন পড়া মুখস্থ না দিতে পারলে উপরের ক্লাস থেকে নীচের ক্লাসে নেমে যায়, বালীর লোকেরাও তেমনি অসবর্ণ বিবাহের ফলে উল্টো প্রমোশন পায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে বলীদ্বীপে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন সে প্রথা উঠে গিয়েছে। এখন সতী যায় শুধু রাজার ঝি বৌরা। এর কারণ বোধ হয় রাজারা অবলাদের আঁচল না ধরে স্বর্গেও যেতে পারে না। সে যাই হোক, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেন্টিক সাহেব এ দেশে না এলেও এতদিনে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা উঠে যেত,—ছেরেপ কালের গুণে।

বিবাহের পর আসে অবশ্য আহারের কথা। বলীয়ানরা কি খায় তা জানিনে, কিন্তু তারা গো-মাংস ভক্ষণ করে না; এমন কি বলীদ্বীপে গো-হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারা কিন্তু শূয়োর নিত্য খায়, তবে তাতে তাদের হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না। সে দেশে সকল বরাহই বন্যবরাহ, কারণ দেশটাই হচ্ছে বুনো দেশ।

তাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় দু কথায় দিই। ভারতবর্ষের সব দেবতা বলীদ্বীপে গিয়ে জুটেছেন। এমন কি কার্ত্তিক সমুদ্র লঙ্ঘন করেছেন ময়ূরে চড়ে, আর গণেশ ইঁদুর চড়ে। ইঁদুর যে পিঁপড়ের মত চমৎকার সাঁতার কাট্‌তে পারে, তা বোধ হয় তোমরা সবাই জানো, কারণ ছেলেরা চিরকালই মেয়েদের কাছে শুনে আসছে যে, পিঁপড়ে খেলে সাঁতার শেখা যায়।

কিন্তু সেখানকার মহাদেব হচ্ছেন "কাল"; আর মহাদেবী "দুর্গা"।

বলীদ্বীপের দুর্গাপূজা নৈমিত্তিক নয়, নিত্য। বলীদ্বীপের অধিবাসীরা বৌদ্ধও নয়, বৈষ্ণবও নয়। ও-সব ধর্ম্ম গ্রহণ করলে তাদের প্রধান ব্যবসা—অস্ত্রের ব্যবসা—যে মারা যায়। আর বাকী থাকে শুধু বস্ত্রের ব্যবসা। একমাত্র বস্ত্রের সাহায্যে স্বরাজ হয়ত লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু রক্ষা করা যায় না।

বলীদ্বীপের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, দেবদেবতার সংক্ষেপে যে পরিচয় দিলুম, তার থেকেই বুঝতে পারছ তারা যে হিন্দু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এমন কি, যে-সব ইউরোপীয়ের সে দেশের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁরা বলেন যে তাদের যদি কেউ অহিন্দু বলে, তাহলে তারা অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ওঠে।

বলীদ্বীপে যখন ব্রাহ্মণ আছে, তখন সেদেশে নিশ্চয় পণ্ডিতও আছে। এই পণ্ডিতদের নাম "পেদণ্ড"। বালীর পণ্ডিতরা সংস্কৃত পণ্ডিতের অপভ্রংশ না হয়ে কি করে যে ইংরাজী Pedant-এর অপভ্রংশ হল, সে রহস্য আমি উদ্‌ঘাটিত করতে পারিনে। তবে নামে বড় কিছু আসে যায়-না। আমাদের দেশের পাণ্ডা, বিলেতের Pedant, ও বালীর পেদণ্ড, সবাই একজাত; তিনজনই সমান মূর্খ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে হনুমানকে বলা হয়েছে যে,—

"সর্ব্বশাস্ত্র পড়ে বেটা হলি হতমূর্খ"।

ইউরোপের পণ্ডিতেরা সর্ব্বশাস্ত্র পড়ে' পেডাণ্ট হয়, বলীদ্বীপের পণ্ডিতরা কোনও শাস্ত্র না পড়েই পেদণ্ড হয়; পূর্ব্ব পশ্চিমের ভিতর এই যা প্রভেদ। আমরা পূর্ব্ব, সুতরাং 'অন্ত' হবার চাইতে 'অণ্ড' হবার দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশি।

এই কারণে আমার বলীদ্বীপে যাবার ভয়ঙ্কর লোভ হয়, উক্ত দ্বীপে পেদণ্ডদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করবার জন্য। এ দেশের পেদণ্ডদের কাছে শাস্ত্রালোচনা ঢের শুনেছি, কিন্তু বলীদ্বীপের পেদণ্ডদের কাছে অনেক নূতন কথা শুনতে পাব বলে আশা আছে। সম্ভবত সে সবই পুরোনো কথা, কিন্তু এত পুরোনো যে, আমার কাছে তা সম্পূর্ণ নূতন বলে মনে হবে।

দুঃখের বিষয়, বলীদ্বীপে যাবার বল এ বয়েসে আমার আর নেই। কারণ সে দেশে যেতে হয় "প্লবেন প্লবনেন চ"। আশা করি, তোমরা যখন মানুষ হবে, তখন তোমরা কেউ কেউ ও দেশে একবার হাওয়া বদলাতে যাবে,— বিদেশে হিন্দু সভ্যতার নয়, হিন্দু অসভ্যতার নিদর্শন দেখতে। আমরা বিলেতি পলিটীকাল সভ্যতা যেরূপ তেড়ে মুখস্থ করছি, তাতে আশা করতে পারি যে তোমরা যখন বড় হবে, তখন এ দেশের শিক্ষিত লোক এই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, হিন্দু-সভ্যতা অতি মারাত্মক অসভ্যতা। আর পূর্ব্বে যে তা সংক্রামক ছিল, তার পরিচয় ঐ সব দেশেই পাবে। ভবিষ্যতে তোমাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যদি কিছুমাত্র মায়া নাও থাকে, তবু Ethnology-র উপর মায়া ত বাড়বে। আর বলীদ্বীপের পেদণ্ডদের কাছে ও-বিজ্ঞানের সরু মোটা অনেক তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারবে। পৃথিবীতে অসভ্য লোক না থাক্‌লে Ethnology, Anthropology প্রভৃতি বিজ্ঞানের জন্ম হত না; যেমন পৃথিবীতে রোগ না থাক্‌লে চিকিৎসাবিজ্ঞান জন্মাত না। সুতরাং আশা করি, আর কোন কারণে না হোক্, বিজ্ঞানের খাতিরেও বলীয়ানরা আর কিছুদিন তাদের অসভ্যতা রক্ষা করে বেঁচে থাক্‌বে। তবে তাদের পাশে

রয়েছে ওলন্দাজরা তারা ইতিমধ্যে তাদের সভ্য না করে তোলে। আর ওলন্দাজী সভ্যতা আত্মসাৎ করতে পারলেই তারা আমাদেরই মত সভ্য হয়ে উঠবে। ইংরাজী সভ্যতার সঙ্গে ওলন্দাজী সভ্যতার শুধু সেইটুকু প্রভেদ, Whiskey ও Gin-এর ভিতর যে প্রভেদ। আসলে ও-দুই এক। ও-দুয়ের নেশাই সমান ধরে। আর তার ফলে কারও দুর্ব্বল দেহকে সবল করে না, শুধু সকলের সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে।

সে যাই হোক, এই ক্ষুদ্র দ্বীপ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে এতক্ষণ ধরে যে বক্তৃতা করলুম, তার উদ্দেশ্য তোমাদের দ্বীপান্তর-গমনের প্রবৃত্তি উদ্রেক করা নয়,—আমাদের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে তোমাদের কৌতূহল উদ্রেক করা। নিজের দেশের অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ায় কোন লাভ নেই, কারণ যার অতীত অন্ধকার তার ভবিষ্যতও তাই—অর্থাৎ সেই জাতের, যার অতীত বলে একটা কাল ছিল।

মহাভারত ও গীতা

(১)

দেশপূজ্য ও লোকমান্য ৺বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একখানি বিরাট ভাষ্য রচনা করেছেন, এবং মহাত্মা তিলকের অনুরোধে ৺জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় সে গ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদ করেছেন। সে ভাষ্য যে কত বিরাট তার ইয়ত্তা সকলে এই থেকেই করতে পারবেন যে গীতার সপ্তশত শ্লোকের মর্ম্ম প্রায় সপ্তবিংশতি সহস্র ছত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ভাষ্য এত বিশাল হবার কারণ এই যে, এতে বেদ, উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি সমগ্র সংস্কৃতশাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুবিচার করা হয়েছে। মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থে যে বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান, যে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন,—তা' যথার্থই অপূর্ব্ব। সমগ্র মহাভারতের নৈলকণ্ঠীয় ভাষ্যও আমার বিশ্বাস, পরিমাণে এর চাইতে ছোট। তাইতে মনে হয় যে এ ভাষ্য মহাত্মা তিলক, প্রাকৃতে না লিখে সংস্কৃতে লিখলেই ভাল করতেন। কারণ এ গ্রন্থের পারগামী হতে পারেন, শুধু সর্ব্বশাস্ত্রের পারগামী পণ্ডিতজনমাত্র, আমাদের মত সাধারণ লোক এ গ্রন্থে প্রবেশ করা মাত্রই বলতে বাধ্য হবে যে,

"ন হি পারং প্রপশ্যামি গ্রন্থস্যাস্য কথঞ্চন।
"সমুদ্রস্য মহতো ভুজাভ্যাং প্রতরন্নরঃ॥" *

* মহাভারতের উপরোক্ত শ্লোকের আমি কেবল একটি শব্দ বদলে দিয়েছি, "দুঃখস্যাস্য" পরিবর্ত্তে "গ্রন্থস্যাস্য" বসিয়ে দিয়েছি। আশা করি, তাতে "অর্থের" কোনও ক্ষতি হয়নি।

(২)

মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন "কর্ম্মযোগ"। কেননা তিনি ঐ সুবিস্তৃত বিচারের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, গীতা কর্ম্মত্যাগের শিক্ষা দেয় না, শিক্ষা দেয় "কর্ম্মযোগের"। আর যোগ মানে যে "কর্ম্মসু কৌশলং" এ কথা ত স্বয়ং বাসুদেব গোড়াতেই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। নীলকণ্ঠ গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন এই ক'টি কথা বলে' ঃ—

"প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্‌গুরূন্
সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥"

নীলকণ্ঠ অতি সাদা ভাবে স্বকীয় ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে-কথা মুখ ফুটে বলেছেন, গীতার সকল টীকাকারই সে-কথা স্পষ্ট করে না বললেও চাপা দিতে পারেন না। সকলেই স্ব-সম্প্রদায় অনুসারে ও-গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। যিনি জ্ঞানমার্গের পথিক, তিনি গীতাকে জ্ঞানপ্রধান ও যিনি ভক্তিমার্গের পথিক, তিনি গীতাকে ভক্তিপ্রধান শাস্ত্র হিসাবেই আবহমান কাল ব্যাখ্যা করে এসেছেন। মহাত্মা তিলক তাঁর ভাষ্যে, উক্ত কাব্য অথবা স্মৃতির পঞ্চদশখানি পূর্ব্ব-টীকার যুগপৎ বিচার ও খণ্ডন করেছেন। উক্ত পোনেরো খানিই যে স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারেই রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাত্মা তিলকও স্ব-সম্প্রদায় অনুসারেই তার নূতন ব্যাখ্যা করেছেন। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, মহাত্মা তিলক কোন্ সম্প্রদায়ের

লোক ? তার উত্তর—এ যুগে আমরা সকলেই যে-সম্প্রদায়ের লোক, তিনিও সেই একই সম্প্রদায়ের লোক। এ যুগ জ্ঞানের" যুগ নয়, বিজ্ঞানের যুগ ; ভক্তির যোগ নয়, কর্ম্মের যুগ মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, আমাদের জন্মভূমি হচ্ছে কর্ম্মভূমি। ভারতবর্ষ পৌরাণিক যুগে মানুষের কর্ম্মভূমি ছিল কি না জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের এ যুগ যে ঘোরতর কর্ম্মযুগ, সে বিষয়ে আশা করি, শিক্ষিত সমাজে দ্বিমত নেই। এতদ্দেশীয় ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক, সকলেই জীবনে না হোক্ মনে doctrine of action-এর অতি ভক্ত। সন্ন্যাসী হবার লোভ আমাদের কারও নেই ; যদি কারও থাকে ত সে একমাত্র পলিটিকেল সন্ন্যাসী হবার। বলা বাহুল্য যে পলিটিক্স্ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাপার, জ্ঞানকাণ্ডের নয়, ভক্তিকাণ্ডেরও নয়। সংসারের প্রতি বিরক্তি নয়, আত্যন্তিক অনুরক্তিই পলিটিক্সের মূল। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধান প্রভেদ এই কি নয় যে, সে দেশের লোক 'অজরামরবৎ' বিদ্যা ও অর্থের চর্চ্চা করে, আর আমরা 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' ধর্ম্মচিন্তা করি। আমার কথা যে সত্য তার টাট্‌কা প্রমাণ, মহাত্মা তিলকের একটি আজীবন পলিটিকাল সহকর্ম্মী—লালা লাজপত রায়, এই সেদিন সকলকে বলে গেলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম আসলে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম নয়, কর্ম্মের ধর্ম্ম ; এবং সেই সঙ্গে আমাদের সকলকে কায়মনোবাক্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করবার জন্য গীতার মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করবার আদেশ দিয়ে গেলেন, বোধ হয় এই ভয়ে যে, মনোযোগ সহকারে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ করলে, আমাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হয়ত নিস্তেজ হয়ে পড়্‌তে পারে। এ ভয় অমূলক নয়।

(৩)

ইংরাজের শিষ্য আমরা যেমন কর্ম্মের উপাসক, শ্রীধরের শিষ্য নীলকণ্ঠও তেমনি ভক্তির উপাসক ছিলেন, তথাপি তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে :—

"ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী মতা॥
কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানভেদৈঃ শাস্ত্রং কাণ্ডত্রয়াত্মকম্।
অন্ত্যে তূপাসনাকাণ্ডাত্তৃতীয়ো নাতিরিচ্যতে॥
তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি ত্বং নেদং যত্তদুপাসতে।
ইতি শ্রুত্যৈব বেদ্যস্য হ্যুপাস্যাদন্যতেরিতা॥
ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী ক্রমাৎ ষটকৃত্রিণেন হি।
কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডত্রিতয়াত্মা নিগদ্যতে।"

নীলকণ্ঠের এই সরল কথাই হচ্ছে সত্যকথা। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় যে কর্ম্মকাণ্ডের, মধ্যের ছয় অধ্যায় যে ভক্তিকাণ্ডের, আর শেষ ছয় অধ্যায় যে জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত, এরকম তিন অংশে সমান ও পরিপাটী ভাগবাটোয়ারার হিসেব আমরা না মানলেও, এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য যে, ও-শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি তিনই আছে। ও-গ্রন্থ একে তিন, কিন্তু তিনে এক নয়। গীতায় ও-ত্রি-কাণ্ডের রাসায়নিক যোগের ফলে কোনও একটি নবকাণ্ডের সৃষ্টি হয় নি। এই কারণে গীতার এমন কোনও এক ব্যাখ্যা হতে পারে না, যা চূড়ান্ত হিসেবে সর্ব্বলোকগ্রাহ্য হবে, কেননা এ ক্ষেত্রে তিন রকম ব্যাখ্যারই সমান

অবসর আছে। গীতার অন্তরে নানারূপ ধাতু আছে। কোন ভাষ্যকারই তাকে ব্যাখ্যার বলে তাঁর মনোমত এক ধাতুতে পরিণত করতে কৃতকার্য্য হবেন না—তা সে ধাতু, জ্ঞানের স্বর্ণ ই হোক্ আর কর্ম্মের লৌহই হোক্। পূর্ব্বাচার্য্যেরা প্রধানতঃ গীতাভাষ্যে জ্ঞান-ভক্তি-মার্গই অবলম্বন করেছিলেন—গীতার ধর্ম্ম যে মুখ্যতঃ সন্ন্যাসের ধর্ম্ম নয়, ভগবৎ-গীতা যে অবধূত-গীতা ও অষ্টাবক্র-গীতার জ্যেষ্ঠ-সহোদর নয়, এ কথা কিন্তু আজ আমরা জোর করে বল্‌তে পারি।

গীতার মতকে কর্ম্মযোগ বলবার আমাদের অবাধ অধিকার আছে। আর যুগধর্ম্মানুসারে আমরা গীতা নিংড়ে সেই মতই বার করবার চেষ্টা করব। আর এ প্রযত্ন মহাত্মা তিলকের তুল্য আর কে কর্‌তে পারেন? এ যুগের তিনিই যে হচ্ছেন অদ্বিতীয় কর্ম্মযোগী, এ সত্য আর শিক্ষিত অশিক্ষিত কোন্ ভারতবাসীর নিকট অবিদিত? এই গীতাভাষ্যও মহাত্মা তিলকের কর্ম্মযোগের অদ্ভুত ক্রিয়া। জ্ঞানের তরফ থেকে শঙ্করের ভাষ্য যেমন একমেবাদ্বিতীয়ং, কর্ম্মের তরফ থেকে মহাত্মা তিলকের ভাষ্যও, আমার বিশ্বাস, তেমনি একমেবাদ্বিতীয়ং হয়ে থাক্‌বে।

৪

গীতা কর্ম্মমার্গের, জ্ঞান-মার্গের কি ভক্তি-মার্গের শাস্ত্র, এ তর্ক হচ্ছে এ দেশের ও সেকালের। কিন্তু এই গ্রন্থ নিয়ে এ যুগে এক নূতন তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সে তর্কটা যে কি তা মহাত্মা তিলকের ভাষাতেই বিবৃত করছি।

[—"গ্রন্থ কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচনা করিয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ—কাব্যদৃষ্টিতে তাহাতে কতটা মাধুর্য্য ও প্রসাদ-গুণ আছে, গ্রন্থের শব্দরচনা ব্যাকরণ-শুদ্ধ অথবা তাহাতে কতকগুলি আর্ষ-প্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন্ কোন্ মতের, স্থলের কিংবা ব্যক্তির উল্লেখ আছে, এই সকল ধরিয়া গ্রন্থের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে কি না, ইত্যাদি"—]

এরূপ আলোচনাকে মহাত্মা তিলক "বহিরঙ্গ পর্য্যালোচনা" বলেন।—

এ আলোচনা আমরা অবশ্য বিলেত থেকে আমদানী করেছি।

["পরন্তু, এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুকরণে এ দেশের আধুনিক বিদ্বানেরা গীতার বাহ্যাঙ্গেরই বিশেষ অনুশীলন করিতেছেন"।]

এরূপ আলোচনার প্রতি যাঁরা আসক্ত তাঁদের প্রতি মহাত্মা তিলক যে আসক্ত নন, তার পরিচয় তিনি নিজ মুখেই দিয়াছেন। তিনি বলেন :—

["বাগ্‌দেবীর রহস্যজ্ঞ ও তাহার বহিরঙ্গ-সেবক এই উভয়ের ভেদ দর্শন করিয়া মুরারি কবি এক সরস দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :—]

অব্ধির্লঙ্ঘিত এব বানরভটৈ কিং ত্বস্য গম্ভীরতাম্।
আপাতাল-নিমগ্ন পীবরতনুর্জানাতি মন্থাচলঃ॥

আর গ্রন্থ-রহস্য মধ্যে মন্দার পর্ব্বতের মত আপাতাল-নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তরঙ্গ পর্য্যালোচনা।—মুরারি কবির এই সরস উক্তিটি অবশ্য দেশী বিলেতি বহিরঙ্গ সেবকদের কর্ণে একটু বিরস ঠেক্‌বে। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁরা মদমত্ত জর্ম্মাণ পাণ্ডিত্যের উল্লম্ফন নিরীক্ষণ

করেছেন, তাঁদের পক্ষে মুরারি কবির উক্তির পুনরুক্তি করবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন।

কাব্যের অন্তরঙ্গের সাধনা ও বহিরঙ্গের সেবা এ দুটি ক্রিয়ার ভিতর যে শুধু প্রভেদ আছে তাই নয়; এর একটি প্রযত্ন অপরটির অন্তরায়। কাব্যের ভিতর থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে বসলে দেখা যায় যে, তার কাব্যরস শুকিয়ে এসেছে আর তার ভিতর নিমজ্জিত ঐতিহাসিক উপলখণ্ড সব দন্তবিকাশ করে হেসে উঠেছে। আমাদের মত কাব্য-রসিকরা কাব্যের সর্মগ্ররূপ দেখেই মোহিত হই, অপরপক্ষে পণ্ডিতেরা কাব্যের রস জিনিষটিকে উপেক্ষা করেন—অন্ততঃ জর্ম্মাণ পণ্ডিতেরা কাব্যের সম্মুখীন হ'বামাত্র তাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ—

"মাইরি রস ঘুরে ব'স্,
দাঁত দেখি তোর বয়েস কত"।

এরি নাম Scholarship।

তবে এ রকম ঐতিহাসিক কৌতূহল যখন মানুষের মনে একবার জেগেছে, তখন কাব্যের ঐ বহিরঙ্গ পর্য্যালোচনায় যোগ দেবার প্রবৃত্তি দমন করা অসম্ভব—বিশেষতঃ আধুনিক বিদ্বান ব্যক্তিদের পক্ষে। অন্যে পরে কা কথা,—মহাত্মা তিলকও গীতার বহিরঙ্গ পর্য্যালোচনার মায়া কাটাতে পারেন নি। তিনি তাঁর গীতাভাষ্যের পরিশিষ্টে অতি বিস্তৃত ভাবেই এই বাহ্যবিচার করেছেন। এতে আমি মোটেই আশ্চর্য্য হইনি। এই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শাস্ত্র বিচারের এ দেশে রাজা ছিলেন ৺রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর। আর মহাত্মা তিলক যে-পুরিকে পুণ্য-

পুণাপুর বলেন, সেই পুরিই হচ্ছে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের রাজধানী এবং সেই পুরিতেই এ দেশের যত বড় বড় Orientalist অবতীর্ণ হয়েছেন। "কর্ম্মযোগে" যত সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উল্লেখ আছে সে সবই মহারাষ্ট্রীয়—একটিও বঙ্গদেশীয় নয়। স্বয়ং মহাত্মা তিলক হচ্ছেন, এই বিলেতি দস্তুর-পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব এতই অসামান্য যে, পাশ্চাত্য Orientalist সমাজেও তিনি অতি উচ্চ আসন লাভ করেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বিশেষ করে এই মহা প্রশ্ন তুলেছেন যে মহাভারতে ভাগবৎ-গীতা প্রক্ষিপ্ত কি না। মহাত্মা তিলক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে—

["যে ব্যক্তি বর্ত্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই বর্ত্তমান গীতাও বিবৃত করিয়াছেন"।]

এ সিদ্ধান্তে তিনি অবশ্য উপনীত হয়েছেন বাহ্য-প্রমাণের বলে। কেননা তিনি একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে—

["যাঁহারা বাহ্য-প্রমাণকে মানেন না এবং নিজেরই সংশয়-পিশাচকে অগ্রস্থান দেন, তাঁহাদের বিচার-পদ্ধতি নিতান্ত অশাস্ত্রীয় সুতরাং অগ্রাহ্য"।]

মহাত্মা তিলকের মতে "গীতাগ্রন্থ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক, এই ভুল ধারণা হইতেই এই সন্দেহ তো প্রথমে বাহির হয়।" আমি অবশ্য আচার্য্যের শিষ্য নই অর্থাৎ শঙ্কর-পন্থী বৈদান্তিক নই—এমন কি শঙ্করকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলতেও আমার তিলমাত্র দ্বিধা নেই। তবুও মহাত্মা তিলকের সংগৃহীত বাহ্য-প্রমাণ আমার মনের সন্দেহ-পিশাচকে

একেবারে বধ করতে পারে নি। এর প্রকৃত কারণ তিনিই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন "সন্দেহ নিরঙ্কুশ"। আমি অবিদ্বান, কিন্তু "এতদ্দেশীয়" ও আধুনিক। অতএব আমার মনেও অনেক বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। মনোজগতে "আধুনিক" ও "সংশয়-গ্রস্ত" এ দুটি কথা পর্য্যায়শব্দ। যাঁর মনে কোনরূপ সংশয় নেই তাঁর একালে জন্ম আসলে অকালে জন্ম, কারণ দেহে তিনি একেলে হলেও—মনে সেকেলে। এ প্রবন্ধে আমার সেই সন্দেহই আমি ব্যক্ত করতে চাই। পণ্ডিতের বিচারে অবশ্য যোগদান করবার অধিকার আমার নেই, কেননা পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রস্থানভূমি "সন্দেহ" হলেও নিঃসন্দিগ্ধ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই হচ্ছে তাঁদের গম্যস্থান। আর তাঁরা অবলীলাক্রমেই সেখানে পৌঁছে যান। অপরপক্ষে আমি মহাভারতের নানাদেশ পর্য্যটন করে অবশেষে কোনও মানসিক রাজপুতনায় উপনীত হতে পারি নি। কারণ মহাভারতের ভিতর আমার পর্য্যটন শুধু "ভ্রমণ কারণ"। সুতরাং আমি অপণ্ডিত ও কাব্যরসিক বাঙালী হিসাবেই এ বিষয়ে একটু উচ্চবাচ্য করতে চাই।

(৬)

আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে এই "প্রক্ষিপ্ত" কথাটার চল করেছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা। এর একটি স্পষ্ট কারণ আছে। Andre Gide নামক জনৈক বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির উপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আরম্ভেই বলেছেন যে, গীতাঞ্জলির তনুতা দেখেই তিনি পুলকিত হয়েছিলেন। কারণ তার ভয়

ছিল যে, যে-দেশের মহাকাব্যের শ্লোক-সংখ্যা হচ্ছে শত সহস্র, সে দেশের গীতিকাব্যের শ্লোক-সংখ্যা হবে অন্ততঃ এক সহস্র। Andre Gide সংস্কৃত জানেন না. যদি জানতেন ত তিনি মহাভারতের গোড়াতেই দেখ্‌তে পেতেন যে, লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা বলেছেন যে, বর্ত্তমান মহভারত হচ্চে মূল মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। "বিস্তীর্য্যৈতন্মহজ্‌জ্ঞানমৃষি সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ"। লোমহর্ষণ-পুত্রের এ কথা শুন্‌লে Gide সাহেবের যে শুধু লোমহর্ষণ হত তাই নয়—তিনি হয়ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌তেন।

ইউরোপীয়েরা হোমারের ইলিয়াডের পরিমাণকেই মহাকাব্যের Standard মাপ ধরে নিয়েছেন। কিন্তু গ্রীস নামক ক্ষুদ্র দেশের পরিমাণের সঙ্গে, ভারতবর্ষ নামক মহাদেশের পরিমাণের তুলনা করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, কেন ইলিয়াডের মাপের সঙ্গে মহাভারতের মাপ মেলে না ও মিলিতে পারে না। কিন্তু ভৌগোলিক হিসেব অনুসারেই যে কাব্যের দেহ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে হবে, এ কথা তাঁরা মানতে প্রস্তুত নন। তাঁরা বলেন, মানচিত্রের সঙ্গে মন-চিত্রের কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। অতএব মহাভারত যখন কাব্য, তখন নৈসর্গিক নিয়মে তা এতাদৃশ মহাকায় হতে পারে না। কাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও কাব্য-রচয়িতা কবির ত দম বলে একটা জিনিষ আছে। কোনও কবি একদমে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের পাল্লা ছুটতে পার্‌তেন না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, মহাভারতের মধ্যে অধিকাংশ শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত। এর উত্তর হচ্ছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ঐ কাব্য নামেই ভুলেছেন। মহাভারত কাব্য নয়, মহাভারত হচ্ছে একটি Encyclopædia ; সুতরাং

এক লক্ষ শ্লোকের অর্থাৎ দু'লক্ষ ছত্রের বিশ্বকোষকে সংক্ষিপ্ত বললে Andre Gide-ও কোনও আপত্তি করতে পারবেন না। এ গ্রন্থের নাম সংহিতা না হয়ে কাব্য কি করে হল, তার পরিচয় মহাভারতেই আছে। বেদব্যাসের মনে যখন এ গ্রন্থ জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি ব্রহ্মাকে বলেন যে, আমি মনে মনে একখানি কাব্য রচনা করেছি। সে কাব্যে কি কি জিনিষ থাকবে বেদব্যাসের মুখে তার ফর্দ্দ শুনে স্বয়ং ব্রহ্মাও একটু চম্‌কে ওঠেন ও থম্‌কে যান, তারপর তিনি সসম্ভ্রমে বলেন যে, "হে বেদব্যাস, তুমি যখন ও-গ্রন্থকে কাব্য বলতে চাও, তখন ওর নাম কাব্যই হবে, কেননা তুমি কখনও মিথ্যা কথা বলোনা।" এর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান মহাভারতকে কাব্য বলা যায় কি না, সে বিষয়ে স্বয়ং ব্রহ্মারও সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনি যে ও-গ্রন্থকে অবশেষে কাব্য বলতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তার কারণ মহাভারত একাধারে কাব্য আর Encyclopædia ; এবং এই দুই বস্তু একই গ্রন্থের অন্তর্ভূত হলেও মিলেমিশে একদম একাকার হয়ে যায়নি,—মোটামুটি হিসেবে উভয়েই চিরকাল নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আস্‌ছে। মহাভারতের যে-অংশ আমাদের মত অবিদ্বান লোকেরা পড়ে এবং উপভোগ করে সেই অংশ তার কাব্যাংশ; আর যে-অংশ বিদ্বান লোকেরা কষ্টভোগ করে পর্য্যালোচনা করেন, সেই অংশই তার Encyclopædia-র অংশ। এ বিষয়ে বোধ হয় অপণ্ডিত মহলে কোনও মতভেদ নেই।

মহাভারতের এই যুগলরূপের প্রহেলিকাই হচ্ছে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের শান্তিভঙ্গের মূল কারণ। এ হেঁয়ালির যাহোক্ একটা হেস্তনেস্ত না করতে পারলে, পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের পণ্ডিতী মনের শান্তি

ফিরে পাবেন না। এর জন্য তাঁরা সকলে মিলে পাণ্ডিত্যের দাবাখেলা খেলতে সুরু করেছেন। এ খেলায় সকলেই সকলকে মাৎ করতে চান্। আমি সে খেলার দর্শক হিসেবে দু'টি একটি উপর-চাল দিচ্ছি। সে চাল নেওয়া না-নেওয়া নির্ভর করছে খেলোয়াড়দের উপর। একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, পণ্ডিতের দল ভারতবর্ষের অতীতকে প্রায় বেদখল করে নিয়েছে। বেদ এখন Philology-র, ইতিহাস Numismatics-এর, এবং আর্ট্ Archæology-র অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছে —অর্থাৎ একাধারে বিজ্ঞানের ও ইংরাজির। এ অবস্থায় মহাভারত যাতে বাঙলা সাহিত্যের হাতছাড়া না হয়ে যায়, সে চেষ্টা আমাদের করা আবশ্যক। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিচারের হট্টগোলে যোগ দেওয়া। হেঁয়ালি সম্বন্ধে বাঙলায় একটা কথা আছে যে,—

মূর্খেতে বুঝিতে পারে।
পণ্ডিতের লাগে ধন্ধ ॥

এই প্রবচনের উপর ভরসা রেখে এ হেঁয়ালির উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

বলা বাহুল্য যে, কাব্য আর Encyclopædia এক বৃন্তের দুটি ফুল নয়। কাব্য মানুষের অন্তর হতে আবির্ভূত হয়, আর Encyclopædia বাহির থেকে সংগৃহীত। সুতরাং এ উভয়েই যে এক স্থানে ও এক ক্ষণে জন্মলাভ করেছে, এ কথা অবিশ্বাস্য। সুতরাং আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, এ দুই পৃথক্ বস্তু; গোড়ায় পৃথক্ ছিল, পরে কালবশে জড়িয়ে গিয়েছে। তারপর প্রশ্ন ওঠে এই যে, কাব্যের স্কন্ধে Encyclopædia

ভর করেছে, না Encyclopædia-র অন্তরে কাব্য কোনও ফাঁকে ঢুকে গেছে? এখন এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ব অবশ্য কাব্যের পূর্ব্বে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বিশ্বকোষ কাব্যের অনেক পরে নির্ম্মিত হয়েছে। এ গ্রন্থের কথার বয়স ওর বক্তৃতার বয়সের চাইতে ঢের বেশি; অর্থাৎ ও-গ্রন্থের সার ওর ভারের চাইতে প্রাচীন। আর ভাগ্যিস ও-সারটুকু তার উপর চাপানো ভারের ভরে মারা যায়নি, তাই ও-কাব্য আজও বজায় আছে। ও-গ্রন্থের কাব্যাংশ অর্থাৎ সারাংশ যদি বিশ্বকোষের চাপে পিষে যেত, তাহলে মহাভারত হত অর্দ্ধেক বৃহৎ-সংহিতা আর অর্দ্ধেক বৃহৎ-কথা; অর্থাৎ তা সকলের পাঠ্য হত না, পাঠ্য হ'ত একদিকে বৃদ্ধের, অপরদিকে বালকের। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পণ্ডিতমণ্ডলী প্রায় একমত। তাঁরা নানা শাস্ত্র ঘেঁটে এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, মূলে এ কাব্যের নাম ছিল "ভারত", তারপরে তার নাম হয়েছে "মহাভারত"। এ সত্য উদ্ধারের জন্য আমার বিশ্বাস নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন ছিলনা। বর্ত্তমান মহাভারতেই ও-দুটি নামই পাওয়া যায়। আর "ভারত" যে "মহাভারত" হয়ে উঠেছে তার মহত্ত্ব ও গুরুত্বের গুণে, অর্থাৎ তার পরিমাণ ও ওজনের জন্যে, এ কথা আদিপর্ব্বেই লেখা আছে।

অতঃপর দেখা গেল যে, মহাভারতের পূর্ব্বে "ভারত" নামক একখানি কাব্য ছিল। মহাভারত আছে, কিন্তু "ভারত" নেই। অতএব এখন প্রশ্ন হচ্ছে—"ভারত" গেল কোথায়? সে গ্রন্থ লুপ্ত হয়েছে, না গুপ্ত হয়েছে? এ প্রশ্নের একটা সোজা উত্তর পেলেই আমরা বর্ত্তমান মহাভারতের কোন্ অংশ তার অপরিমিত মহত্ত্ব ও গুরুত্বের কারণ, তা অনুমান

করতে পারব। মহাত্মা তিলক এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তাঁর বক্তব্য এই যে,—

[সরল শব্দার্থে "মহাভারত" অর্থে বড় ভারত হয়। * * * * * বর্ত্তমান মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উপাখ্যানসমূহের অতিরিক্ত মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা চব্বিশ হাজার, এবং পরে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে উহার নাম "জয়" ছিল। "জয়" শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় বিবক্ষিত বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহাই প্রতীত হয় যে, ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রথমে "জয়" নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, পরে সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যেই অনেক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারেরও নির্ণয়কারী এই এক বড় মহাভারতে পরিণত হইয়াছে।]

অর্থাৎ "জয়" ওরফে "ভারত" কাব্য লুপ্ত হয়নি, মহাভারতের অন্তরেই তা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে মহাভারতের মহত্ত্ব ও গুরুত্বের চাপের ভিতর থেকে "জয়ের" ক্ষুদ্র দেহ উদ্ধার করা অসম্ভব। 'ভারত" যে লুপ্ত হয়নি, এ বিষয়ে আমি মহাত্মা তিলকের মত শিরোধার্য্য করি, কারণ সে কাব্যের লুপ্ত হবার কোনও কারণ নেই। সেকালে ছাপাখানা ছিলনা, সব গ্রন্থই হাতে লিখতে হত, সুতরাং উপযুক্ত লেখকের অভাবে বড় ভারতেরই লুপ্ত হবার কথা, ছোট ভারতের নয়। সেকালে একটানা শত সহস্র শ্লোক লেখবার লোক যে কতদূর দুষ্প্রাপ্য ছিল তার প্রমাণ—স্বয়ং ব্রহ্মা বেদব্যাসের মনঃ-কল্পিত গ্রন্থ লেখবার ভার গণেশের উপর দিয়েছিলেন। দেশে লেখবার মানুষ পাওয়া গেলে, আর হিমালয় থেকে লম্বোদর দেবতাকে টেনে

আনতে হত না। ভগবান গজাননও যে ইচ্ছাসুখে এই বিরাট গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করতে রাজি হন নি, তার প্রমাণ, তিনি লেখা ছেড়ে পালাবার এক ফন্দি বার করেছিলেন। তিনি ব্যাসদেবকে বলেন যে,—"আমি বৃথা সময় নষ্ট করতে পারব না। আপনি যদি গড়্ গড়্ করে' শ্লোক আবৃত্তি করে' যান, তাহলে আমি ফস্ ফস্ করে' লিখে যাব। আর আপনি যদি একবার মুখ বন্ধ করেন ত, আমি একেবারে কলম বন্ধ করব।" বেদব্যাস কি করে' হাঁপ ছেড়ে জিরিয়েছিলেন, অথচ হেরম্বকে দিয়ে আগাগোড়া মহাভারত লিখিয়ে নিয়েছিলেন, সে কথা ত সবাই জানে। গণেশকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেবার জন্য তিনি অষ্টসহস্র অষ্টশত শ্লোক রচনা করেন, যার অর্থ তিনি বুঝতেন আর শুকদেব বুঝতেন, আর সঞ্জয় হয়ত বুঝতেন, হয়ত বুঝতেন না; সেই ৮৮০০ শ্লোক যদি কেউ মহাভারত থেকে বেছে ফেলতে পারেন, তাহলে তিনি আমাদের মহা উপকার করবেন। তবে জর্ম্মাণ পণ্ডিত ছাড়া এ কাঁটা বাছবার কাজে আর কেউ হাত দেবেন না।

তারপর বড় বই লেখাও যেমন শক্ত, পড়াও তেমনি শক্ত। এমন কি, সেকালের পণ্ডিত লোকেও বড় বই ভালবাসতেন না। এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের মত হাজার হাজার পাতা বই গেলা এতদ্দেশীয়দের পক্ষে অসম্ভব। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদের বিরাট গ্রন্থ যে ইষ্ট ছিল না, সে কথা মহাভারতেই আছে। "ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাস-ধারণম্।" সুতরাং লেখার হিসেব থেকে হোক্ আর পড়ার হিসেব থেকেই হোক্, দু'হিসেব থেকেই আমরা মানতে বাধ্য যে "ভারত" লুপ্ত হয়নি, ও-কাব্য মহাভারতের অন্তরে সেই ভাবে অবস্থিতি করছে, যে ভাবে শকুন্তলার আংটি মাছের পেটে অবস্থিতি করেছিল।

আমরা যদি মহাভারতের ভিতর থেকে "ভারত"কে টেনে বার করতে পারি, তাহলে "ভারতের" অন্তরে ও অঙ্গে কোন্ কোন্ উপাখ্যান, ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার প্রক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার একটা মোটামুটি হিসেব পাই। আর যদি ধরে নিই যে, মহাভারতের অতিরিক্ত মালমস্‌লা সব ঐ ভারত-কাব্যের ভিতর interpolated হয়েছে, তাহলে অবশ্য ঐ শ্লোকস্তূপের ভিতরে "ভারতের" সন্ধান আমরা পাবনা। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি গ্রীক-দেবতা Hercules এর মত ওরকম পঙ্কোদ্ধার করতে প্রবৃত্ত হবেন। অপর পক্ষে গ্রীকবীর Alexander-এর মত এই জটিল গ্রন্থের Gordian knot যদি আমরা দ্বিখণ্ড করতে পারি, তাহলে হয়ত মহাভারত থেকে "ভারত"কে পৃথক করে নিতেও পারি।

(৯)

Interpolation-এর দৌলতেই "ভারত" যে "মহাভারতে" পরিণত হয়েছে, সে বিষয়ে দেশী বিলেতি সকল আধুনিক পণ্ডিত একমত।

কিন্তু এই interpolation—ভাষান্তরে "প্রক্ষিপ্ত" কথাটা তাঁরা যে কি অর্থে ব্যবহার করেন, সেটা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।

যদি তাঁদের মত এই হয় যে, যেমন মোরগের পেটে চাল পূরে' দিয়ে একাধারে কাবাব ও পোলাও বানানো হয়, তেমনি 'ভারতের' অন্তরে নানা বস্তু নানা যুগে পূরে' দিয়ে তার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সাধন করা হয়েছে, তাহলে সে মত আমি সন্তুষ্ট মনে গ্রাহ্য করতে পারিনে।

আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান মহাভারতের কতক অংশ "ভারতের" ভিতর পূরে দেওয়া হয়েছে, এবং অনেক অংশ তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রক্ষিপ্ত অংশের বিচার এখন স্থগিত রেখে, যদি আমরা তার সংযোজিত অংশকে ভারতকাব্য থেকে বিযুক্ত করতে পারি, তাহলে আমাদের সমস্যা অনেক সরল হয়ে আসে।

আমরা যদি সাহস করে' এক কোপে মহাভারতকে দ্বিখণ্ড করে ফেলতে পারি, তাহলে আমার বিশ্বাস "ভারতকে" মহাভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি। বর্ত্তমান মহাভারতের নয় পর্ব্ব হচ্ছে প্রাচীন-ভারত, আর তার বাদবাকী নয় পর্ব্ব হচ্চে অর্ব্বাচীন-মহাভারত—এই হিসেবটাই হচ্ছে গণিতের হিসেবে সোজা; অতএব অপণ্ডিতদের কাছে গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

প্রথম নয় পর্ব্বের ভিতর অবশ্য অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে, যা পূর্ব্বে ভারত-কাব্যের অঙ্গস্বরূপ ছিল না; কিন্তু শেষ নয় পর্ব্বের ভিতর সম্ভবতঃ এমন একটি কথাও নেই, যা পূর্ব্বে ভারতকাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সংক্ষেপে, দুইখানি বই একসঙ্গে জুড়ে মহাভারত তৈরী করা হয়েছে। এ দুইখানি গ্রন্থকে "পূর্ব্ব ভারত" ও "উত্তর ভারত" আখ্যা দেওয়া চলে। সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে এরকম কাব্য আরও অনেক আছে। কাদম্বরী, কুমার-সম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতির এইরকম দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে। পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ অবশ্য একই হাতের লেখা এবং একই কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গ। কাদম্বরীর পূর্ব্বভাগ বাণভট্টের রচনা, আর উত্তরভাগ তাঁর পুত্রের। কুমার-সম্ভবের পূর্ব্বভাগ কালিদাসের রচনা, আর উত্তরভাগ আর যারই লেখা হোক্, কালিদাসের লেখা নয়।

এমন কি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড যে বাল্মীকির লেখনীপ্রসূত নয়—সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

(১০)

মহাভারতকে এরকম দ্বিধাবিভক্ত করা নেহাৎ গোঁয়ারতুমি নয়। সত্যসত্যই দুটি আধখানিকে গ্রথিত করে' মহাভারত নামে একখানি গ্রন্থ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ চিরকালই রয়ে যাবে, কেননা মহাভারত সংক্রান্ত বড় বড় আবিষ্কার সম্বন্ধে সমান সন্দেহ রয়ে গেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। Dahlmann নামক জনৈক ধনুর্ধর জর্ম্মাণ পণ্ডিত আজীবন গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহাভারত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। অপর পক্ষে Holtzmann নামক অপর একটি সমান ধনুর্ধর জর্ম্মাণ পণ্ডিত আজীবন গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে, মহাভারত খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই উভয় আবিষ্কারই যুগপৎ সমান সত্য হতে পারে না। ফলে এর একটিও সত্য কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ লোকের মনে থেকেই যায়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের প্রতি ভক্তি কারও কমেনি। বিদ্বান ব্যক্তিদের পদানুসরণ করেই আমি আমার মত ব্যক্ত করছি। সে মত যাঁর খুসী গ্রাহ্য করতে পারেন, যাঁর খুসী অগ্রাহ্য করতে পারেন; শুধু আমার মতকে সম্পূর্ণ গাঁজাখুরি মনে করবেন না। আমার মত আমি শূন্যে খাড়া করিনি। এ সত্যের মূল মহাভারতের ভিতরেই আছে। আপনাদের পূর্ব্বে বলছি যে, পুরাকালে ভারত-কাব্যের অপর নাম ছিল জয়কাব্য; অর্থাৎ

এ-কাব্যে ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের কথা; সুতরাং যুদ্ধ-জয়ের পরবর্ত্তী কোন বিষয়ের বর্ণনা বা আলোচনা এতে ছিল না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে, মহাভারত হচ্ছে যুদ্ধপ্রধান গ্রন্থ, এবং ও-কাব্যের প্রধান বিষয় যা, তা শেষ হয়েছে সৌপ্তিক পর্ব্বে। এ কথা যে সত্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। যুদ্ধ করবার লোক না থাকলে আর যুদ্ধ করা যায় না। আর সৌপ্তিক পর্ব্বের শেষে দেখতে পাই যে, অশ্বত্থামা মুমূর্ষু দুর্য্যোধনকে বলেছেন যে, উভয়পক্ষের সকল যোদ্ধা নিহত হয়েছে; অবশিষ্ট আছে শুধু কৌরব-পক্ষের তিনজন—কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও স্বয়ং অশ্বত্থামা। অপরপক্ষে পাণ্ডবদের ভিতর অবশিষ্ট আছে সাতজন—পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকী ও কৃষ্ণ। এ কথা বলেই অশ্বত্থামা চলে গেলেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আশ্রমে, কৃতবর্ম্মা স্বরাষ্ট্রে, ও কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে। এইখানেই ভারত নাটকের যবনিকা পতন হয়েছে। এর পর মহাভারতে যা আছে, সে হচ্ছে যুদ্ধের নয়, শান্তির কথা। বর্ত্তমান মহাভারত অবশ্য এদেশের War and Peace নামক মহাকাব্য। কিন্তু মূল ভারত ছিল, Iliad-এর মত শুধু যুদ্ধ-কাব্য। কাব্যকে আমরা ফুল বলি। এ হিসেবে সৌপ্তিক-পর্ব্বকেই আমরা ভারত কাব্যের শেষ পর্ব্ব বলে স্বীকার করতে বাধ্য। আদিপর্ব্বে আছে যে, মহাভারত নামক মহাবৃক্ষের সৌপ্তিক পর্ব্ব হচ্ছে—প্রসূন, আর শান্তিপর্ব্ব—মহাফল। ফুল যখন ফলে পরিণত হয়, তখনই তা কাব্যের বহির্ভূত হয়ে পড়ে। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে এই "উত্তরভারতে" কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত আর কোন্ শ্লোক নয়, তা নিয়ে মাথাঘামানোর প্রয়োজন নেই, কারণ ও-গ্রন্থ— আগাগোড়াই প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত অংশের সন্ধান করতে

হবে পূর্ব্বভারতে। এতে এই খোঁজাখুজির কাজটা অর্দ্ধেক কম হয়ে আসে কি না?

(১১)

সৌপ্তিকপর্ব্ব ভারতকাব্যের অন্তর্ভূত স্বীকার করলে, আমার কল্পিত বিভাগ দুটি ঠিক সমান্ হয় না। কারণ সৌপ্তিকপর্ব্ব হচ্ছে বর্ত্তমান মহাভারতের দশম পর্ব্ব। কিন্তু আসলে আমার হিসেবে ভুল হয়নি। মহাভারতের একটি পর্ব্ব যা "পূর্ব্বভাগে" স্থান পেয়েছে, তা আসলে উত্তর-ভাগের জিনিষ। আদি পর্ব্ব হচ্ছে মহাভারতের অন্তপর্ব্ব। ও-পর্ব্বের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে আমরা যাকে বলি Preface। দ্বিতীয় অধ্যায় Table of contents এবং তার পরবর্ত্তী "কথাপ্রবেশ-পর্ব্ব" হচ্ছে Introduction। এখন এ কথা কে না জানে যে, মুখপত্র, সূচী ও ভূমিকা বইয়ের গোড়াতে ছাপা হলেও লেখা হয় সবশেষে। আমার মত যে সত্য, তার প্রমাণ আদি শব্দের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ স্পষ্ট বলিতেছেন—"আদিত্বঞ্চাস্য ন প্রাথম্যাৎ"। তিনি অবশ্য এর পরে একটা কথা জুড়ে দিয়েছেন; যথা, —কিন্তু সর্ব্বেষামাদিরুৎপত্তিরিহ কীর্ত্ত্যতে ইতি। কোন কাব্যের গোড়াতেই কবি কখনও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কীর্ত্তন করেন না। এই বিশ্বসৃষ্টির বিবরণ ভারতকাব্যের বিষয় নয়, ভারত-বিশ্বকোষের অঙ্গ।

মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করবার আর একটি মুস্কিল আছে। ভারতকাব্য সৌপ্তিক পর্ব্বে শেষ করলে ও-কাব্যের ভিতর থেকে স্ত্রীপর্ব্ব বাদ পড়ে। কিন্তু ও-পর্ব্বকে ভারতের কাব্যাংশ থেকে আমি কিছুতেই বহিষ্কৃত করতে পারিনে। গান্ধারীর বিলাপ না থাকলে ভারতকাব্যের অঙ্গহানি হয়। অপরপক্ষে ও-বিলাপকে আমি

কিছুতেই উত্তরভারতের অন্তর্ভূত করিতে পারিনে। Epic-এর সুর যার কানে লেগেছে, সে ব্যক্তি কখনই স্ত্রীপর্ব্বকে encyclopædia-র অঙ্গ বলে স্বীকার করতে পারেনা। এর প্রমাণস্বরূপ আমি গান্ধারীর মুখের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। শ্মশানে পরিণত যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃখের চরম দশায় উপনীত গান্ধারী যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিগতেশ্বর কুরু-কুলাঙ্গনাদের একে একে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজের কন্যা দুঃশলাকে দেখিয়ে বলেন—"হা হা ধিগ্‌দুঃশলাং পশ্য বীতশোক-ভয়ামিব। শিরোভর্ত্তুরনাসাদ্য ধাবমানামিতস্ততঃ ॥"

যাঁরা শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন পর্ব্ব লিখেছেন, তাঁরা শতসহস্র শ্লোক লিখলেও এর তুল্য একটি শ্লোক লিখ্‌তে পারেন না। এর প্রতি কথার ভিতর থেকে মহাকবির হাত ফুটে বেরচ্ছে। ভারতকাব্যের ভিতর যদি স্ত্রীপর্ব্বকে স্থান দেওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে আর একটি পর্ব্বকে স্থানচ্যুত করতে হয়। আমি বনপর্ব্বকে পূর্ব্ব-ভারত থেকে বহিষ্কৃত করতে প্রস্তুত আছি। ও-পর্ব্বের যে পোনেরো আনা তিন পাই প্রক্ষিপ্ত, এ বিষয়ে সকল পণ্ডিত, মায় তিলক, একমত। সেই এক পাই আমি বিরাটপর্ব্বের অন্তর্ভূত করে, বাদবাকী অংশটি উপাখ্যান পর্ব্ব নামে উত্তরভারতে স্থান দিতে চাই। আর তাতে যদি কারও আপত্তি থাকে তাহলে বলি—পূর্ব্ব-ভারত দশপর্ব্ব, আর উত্তর-ভারত অষ্ট পর্ব্ব।

(১২)

আমি জনৈক বন্ধুর মুখে শুনলুম যে, শান্তিপর্ব্ব থেকে সুরু করে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্টপর্ব্ব যে মহাভারতের অন্তরে পাইকেরি হিসেবে

প্রক্ষিপ্ত—এ কথা নাকি সবাই জানে। যদি তাই হয় ত আমার এ গবেষণার ফল হচ্ছে পণ্ডিতের তেলা মাথায় তেল ঢালা। কিন্তু আমার এই গবেষণা যে বৃথা হয়নি, তার প্রমাণ, মহাত্মা তিলক এ সত্য হয় জানতেন না, নয় মানতেন না। আর পাণ্ডিত্যের হিসেবে তিনি কোনও জর্ম্মাণ পণ্ডিতের চাইতে কম ছিলেন না। তিনি বলেছেন যে, বর্ত্তমান মহাভারত এক হাতের লেখা। বর্ত্তমান মহাভারত যে এক হাতের লেখা নয়, এবং এক সময়ের লেখা নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমি এই অনধিকারচর্চ্চা করতে বাধ্য হয়েছি।

আমার আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে— গীতা মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত কি-না? বর্ত্তমান মহাভারতের শেষ আট পর্ব্ব ছেঁটে দিলেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, কেননা গীতা পূর্ব্ব-ভারতের অন্তর্ভূত (ভীষ্মপর্ব্বের), উত্তর-ভারতের নয়। সুতরাং যে-সমস্যার মীমাংসা করতে হবে সে হচ্ছে এই যে, গীতা ভারত-কাব্যের অঙ্গ, না তার অঙ্গস্থ পরগাছা? গীতাকাব্যের রূপ দেখেই আমরা ধরে নিতে পারিনে যে, ও-ফুল ভারতকাব্যের অন্তর থেকে ফুটে উঠেছে। Orchidএর ফুলও চমৎকার, কিন্তু তার মূল ঝোলে আকাশে।

উক্ত বিচার আমার সময়ান্তরে করবার ইচ্ছা আছে। এস্থলে শুধু একটা কথা বলে রাখি। আদিপর্ব্বে ভীষ্মপর্ব্বকে "বিচিত্র পর্ব্ব" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্ব্বের এই বৈচিত্র্যের কারণ, এতে যুদ্ধ-প্রসঙ্গ ব্যতীত হরেকরকমের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ আছে। ভীষ্মপর্ব্ব এক হাতের লেখা নয়। এ সব প্রসঙ্গের বেশির ভাগই প্রক্ষিপ্ত এবং গীতাও তাই কি না, সেইটিই বিচার্য্য।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম *

(১)

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"—পুরাকালে ভারতবর্ষে কোটি কোটি লোক এই মন্ত্র উচ্চারণ করে' বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হত। কিন্তু এই ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম কালক্রমে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বুদ্ধ কে, তাঁর ধর্ম্ম কি, বৌদ্ধ-সঙ্ঘই বা কি, এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের মধ্যে কোটিতে একজনও দিতে পারতেন না; কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের এই ত্রিরত্নের স্মৃতি পর্য্যন্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। "বৌদ্ধ" এই শব্দটি অবশ্য আমাদের ভাষায় ছিল, এবং "বৌদ্ধ" অর্থে আমরা বুঝতুম—একটি পাষণ্ড ধর্ম্মমত; কিন্তু উক্ত পাষণ্ড মতটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনরূপ ধারণা ছিলনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে; কিন্তু তার কোন বিবরণ নেই। আছে শুধু সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রে এ মতের খণ্ডন। সে খণ্ডন হচ্ছে বৌদ্ধ-দর্শনের। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা দেশে যাঁরা দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করতেন, সেই পণ্ডিতমণ্ডলীও বৌদ্ধ-দর্শন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন। সর্ব্বাস্তিবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ, অথবা ভাষান্তরে সৌতান্ত্রিক মত, বৈভাষিক মত, যোগাচার মত ও মাধ্যমিক মতগুলি যে

---

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্মের" ভূমিকা-স্বরূপ লিখিত।

কি, সে সম্বন্ধে অদ্যাবধি এ দেশের পণ্ডিতসমাজের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। শঙ্করাচার্য্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে' বৈষ্ণব-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জন্মদাতা এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদকর্ত্তা বলে জগৎবিখ্যাত, তাঁর বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে কেন দেওয়া হয়েছে, তা জানতে হলে, শঙ্করের জ্ঞানবাদের সঙ্গে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, তা জানা চাই ; যা এ দেশের অধিকাংশ দর্শন শাস্ত্রীরা জানেন না। এখন এই বৌদ্ধ-দর্শন বুদ্ধের দর্শন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং বৌদ্ধ-দর্শনের বিচার থেকে বুদ্ধদেবের, তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মের এবং তাঁর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই দুদিন আগে আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম।

(২)

আর আজ আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বল্‌তে প্রধানতঃ বৌদ্ধযুগের ইতিহাসই বুঝি, আর হিন্দু কলাবিদ্যা বলতে বৌদ্ধ কলাবিদ্যাই বুঝি। আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করেছি যে, ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগ হচ্ছে এ দেশের সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব-মণ্ডিত যুগ। তাই বৌদ্ধ-সম্রাট অশোক এবং তাঁর অমর কীর্ত্তির দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তারপর আমরা সম্প্রতি এও আবিষ্কার করেছি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা সব বৌদ্ধ ছিলেন ; বাঙলা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি অগ্রগণ্য ধর্ম্মক্ষেত্র ছিল। বাঙলা ভাষার আদি পদাবলী নাকি বৌদ্ধ দোঁহা, ও আদি ধর্ম্মগ্রন্থ "শূন্যপুরাণ"। এ যুগের পণ্ডিতদের মতে বাঙলা ভাষার

'ধর্ম্ম'শব্দের অর্থ বৌদ্ধধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মপূজা মানে বুদ্ধপূজা ; বাঙলা ভাষায় যে-সকল ধর্ম্মমঙ্গল আছে, সে সবই নাকি বৌদ্ধগ্রন্থ। এবং ময়নামতীর উপাখ্যান বৌদ্ধউপাখ্যান। কবিকঙ্কন চণ্ডীতেও বুদ্ধের স্তব আছে। তারপর আমাদের অধিকাংশ দেবদেবীও নাকি ছদ্মবেশী বৌদ্ধ দেব-দেবী। "তারা" যে বৌদ্ধ-দেবতা, তা ত নিঃসন্দেহ। শীতলাও শুনতে পাই তাই। চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবতা বাশুলিও নাকি বৌদ্ধদেবতা, আর বাঙলার পাষাণের পিণ্ডাকার গ্রাম্য মঙ্গলচণ্ডী ছিল আদিতে বৌদ্ধস্তূপ। এ অনুমান সম্ভবতঃ সত্য, কেননা এ সকল দেবদেবী যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের স্বগোত্র ন'ন—অর্থাৎ বৈদিক ন'ন, তাঁদের বংশধরও যে ন'ন, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

বাঙালী সভ্যতার বুনিয়াদ যে বৌদ্ধ, হিন্দু স্তরের দু-হাত নীচেই যে বাঙলার বৌদ্ধ-স্তর পাওয়া যায়, আজকের দিনে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। বাঙলা দেশের মাটী দু-হাত খুঁড়লেই আমরা অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং যদি কেউ বলে—মুসলমান যুগে বাঙালী হিন্দু হয়েছে, তাহলে সে কথা সত্যের খুব কাছ ঘেঁসে যাবে। যে-বৌদ্ধধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ধর্ম্মই যে আজকাল আমাদের সকল গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে. তারই স্মরণ-চিহ্ন উদ্ধার করাই যে আমাদের পাণ্ডিত্যের প্রধান কর্ম্ম হয়ে উঠেছে, এটি সত্য সত্যই একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। এ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল কি করে?—ঘটেছে এই কারণে যে, ভারতবর্ষের এই প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান ইউরোপ, ভারতবাসীর নূতন করে আবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

(৩)

বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমিতে তার মৃত্যু হলেও, আজও তা কোটি কোটি এসিয়াবাসীর ধর্ম্ম। শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকে আজও বুদ্ধদেবের পূজা করে, ও নিজেদের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলেই পরিচয় দেয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হয় সমুদ্রের, নয় হিমালয়ের অপর পারের দেশসকল থেকেই এ দেশের এই লুপ্ত ধর্ম্মের শাস্ত্র-গ্রন্থসকল উদ্ধার করেছেন, এবং তাঁদের বই পড়েই আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করেছি।

সিংহলেই সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়, আর পণ্ডিত-সমাজে অদ্যাবধি এই সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্মই স্বয়ং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম বলেই গ্রাহ্য।

সিংহলের মঠে মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম্মের আদি গ্রন্থগুলি সিংহলী ভাষায় নয়, পালি ভাষায় লিখিত। এই পালি ভাষা যে ভারতবর্ষের একটি প্রাকৃত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; যদিচ সেটি যে ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের ভাষা, উত্তরাপথের না দক্ষিণাপথের, বঙ্গের না কলিঙ্গের, মগধের না মালবের—সে বিষয়ে পণ্ডিতের দল আজও একমত হতে পারেন নি।

সিংহলে যে শুধু বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষিত হয়েছে, তাই নয়—উক্ত ধর্ম্মের জন্মবৃত্তান্ত ও তার সিংহলে প্রচারের ইতিহাসও রক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এই সিংহলী শাস্ত্রই হচ্ছে এ যুগের ইউরোপীয় বৌদ্ধ-শাস্ত্রীদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য দলিল। এবং এই শাস্ত্র

থেকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যে সকল তথ্য উদ্ধার করেছেন -- বর্ত্তমান যুগে তাই আমরা বৌদ্ধমত বলে জানি ও মানি।

(৪)

পালি গ্রন্থসকল আবিষ্কৃত হবার কিছুকাল পরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত খানকতক বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থের সন্ধান নেপালে পাওয়া গেল। সে সব গ্রন্থ আলোচনা করে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দেখতে পেলেন যে, সিংহলী বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও নেপালী বৌদ্ধধর্ম্ম এক নয়। এবং বহুকাল পূর্ব্বে বৌদ্ধমত যে দু-ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ এই দুটি ধারার দুটি বিভিন্ন নাম থেকেই পাওয়া যায়। যে বৌদ্ধমত সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে প্রচলিত, তা "হীনযান" নামে প্রসিদ্ধ; আর যে বৌদ্ধমত নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে প্রচলিত, তার নাম হচ্ছে "মহাযান"। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই দুটি বিভিন্ন মতের নাম দিয়েছেন— Northern School ও Southern School। অনেক দিন ধরে এক দলের ইউরোপীয় পণ্ডিতরা "হীনযান"কেই মূল বৌদ্ধমত ও "মহাযান"কে তার অপভ্রংশ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। ফলে আর একদল পণ্ডিত তার বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন। অবশেষে এই পণ্ডিতের তর্কের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে,—উভয় দলই এখন এ বিষয়ে একমত যে, হীনযান ও মহাযান, এ দুয়ের ভিতর বৌদ্ধধর্ম্মের একই মূলতত্ত্ব পাওয়া যায়, এবং অন্যান্য বিষয়ে উভয় মতের এতটা সাদৃশ্য আছে যে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, একই আদি মত থেকে এই দুটি বিভিন্ন শাখা বিনির্গত হয়েছে।

"মহাযান" মূল বৌদ্ধমতই হোক, কিম্বা তার অপভ্রংশই হোক, সে মত আমাদের কাছে মোটেই উপেক্ষণীয় হতে পারে না। প্রথমতঃ এ শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তারপর চীনে এবং তিব্বতী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ বৌদ্ধ-গ্রন্থই সংস্কৃত-গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। উপরন্তু "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে উক্ত ধর্ম্মের রূপান্তর বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করলে, আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় মনের ইতিহাসের জ্ঞানও লাভ করব। আর তখন হয়ত আবিষ্কার করব যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের মৃত্যু হয়নি। ও-ধর্ম্মমত উপনিষদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হয়েছে— জ্ঞানের ধর্ম্ম কালক্রমে ভক্তির ধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই মহাযান মতের সঙ্গেই অদ্যাবধি আমাদের পরিচয় শুধু নামমাত্র।

(৫)

আমরা অতীতের যে ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্য আজ উঠে পড়ে লেগেছি, সে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস নয়, বৌদ্ধযুগের ইতিহাস—এক কথায় জাতীয় জীবনের বাহ্য ইতিহাস। আমরা যে-কাজ হাতে নিয়েছি তার নাম archæology এবং antiquarianism। বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে তার কি নিদর্শন, কি স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে, আমরা নিচ্ছি তারই সন্ধান, এবং করছি তারই অনুসন্ধান। আমাদের দৃষ্টি বৌদ্ধযুগের স্তূপ, স্তম্ভ, মন্দির ও মূর্ত্তির উপরেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের বিশাল ক্ষেত্রে

মৃত-বৌদ্ধধর্ম্মের বিক্ষিপ্ত অস্থিসকলই আমরা সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আর নানা স্থান থেকে সংগৃহীত অস্থিসকল একত্র জুড়ে যদি আমরা কিছু খাড়া করতে পারি, তাহলে তা হবে সুধু বৌদ্ধধর্ম্মের কঙ্কালমাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের আত্মার সন্ধান না নিয়ে তার মৃতদেহের সন্ধান নেওয়ায়, বলা বাহুল্য আমাদের আত্মজ্ঞান এক চুলও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে না। আর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে যাঁর পরিচয় নেই, তিনি তার দেহের সাক্ষাৎ লাভ করলেও তার রূপের পরিচয় লাভ করবেন না। বৌদ্ধ-স্তূপ তাঁর কাছে একটা পাষাণ স্তূপমাত্রই রয়ে যাবে। ইঁট-কাঠ-গড়া মূর্ত্তিসকল মূক। তারা নিজের পরিচয় নিজমুখে দিতে পারে না, তাদের পরিচয় লাভ করতে হয়, ভাষায় যা লিপিবদ্ধ আছে তারই কাছে। সুতরাং বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম্ম ও তাঁর সঙ্ঘের অজ্ঞতার উপর বৌদ্ধযুগের বাহ্য ইতিহাসও গড়া যাবে না। আমরা বৌদ্ধস্তূপ, স্তম্ভ, মন্দির, মূর্ত্তির মুখে যে কথা সব দিই, সে কথা আমরা বৌদ্ধ-শাস্ত্র থেকেই সংগ্রহ করি। Sanchi এবং Barhut স্তূপের ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন মূর্ত্তিগুলির অর্থ ও সার্থকতা তাঁর পক্ষে জানা অসম্ভব, যাঁর বৌদ্ধ জাতকের সঙ্গে সম্যক পরিচয় নেই। অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করা আমাদের নব-ঐতিহাসিকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

(৬)

পূজ্যপাদ ৺সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম" ব্যতীত বাঙলা ভাষায় আর একখানিও এমন বই নেই, যার থেকে বুদ্ধের জীবন-চরিত, তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্র এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজী ভাষায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের লিখিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে

যে-সকল গ্রন্থ আছে, সেই সকল গ্রন্থের আলোচনা করেই পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয় এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই "বৌদ্ধধর্ম্মে"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করতে তিনি ৮০ বৎসর বয়েসে এক বৎসর কাল যেরূপ অগাধ পরিশ্রম করেছেন, তা যথার্থই অপূর্ব্ব। দিনের পর দিন, সকাল আটটা থেকে রাত আটটা ন'টা পর্য্যন্ত তাঁকে আমি এ বিষয়ে একাগ্রচিত্তে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি। শেষটা যখন তাঁর শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তখনও তিনি হয় আরামচৌকীতে নয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিন এই বইয়ের প্রূফ সংশোধন করতেন। এ সংশোধন শুধু ছাপার ভুলের সংশোধন নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে নতুন নতুন বই পড়ে, তাঁর লেখার যেখানে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করতেন, তা করতে তিনি একদিনও বিরত হননি। তাঁর মৃত্যুর চারদিন আগেও তাঁকে আমি "বৌদ্ধধর্ম্মের" প্রূফ সংশোধন করতে দেখেছি।

এই একাগ্র এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থখানি যতদূর সম্ভব নির্ভুল হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও তার ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে এতদূর মতভেদ আছে, এ বিষয়ে এত সন্দেহের, এত তর্কের অবসর আছে যে, এ বিষয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না, যা চূড়ান্ত বলে পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য হবে। যে-ধর্ম্মের ইতিহাস আট দশ ভাষার বিপুল সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করতে হয়, বলা বাহুল্য সে ইতিহাসের খুঁটিনাটি নিয়ে বিচার তর্ক বহুকাল চলবে, এবং সম্ভবতঃ তা কোন কালেই শেষ হবে না। তবে সে ইতিহাসের একটা ধরবার ছোঁবার মত চেহারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর এ গ্রন্থে পাঠক সেই চেহারারই সাক্ষাৎ পাবেন।

(৭)

আমি পূর্ব্বে যা বলেছি তাই থেকে পাঠক অনুমান করতে পারেন যে—

আমি শুধু পণ্ডিত-সমাজের নয়, দেশসুদ্ধ লোকের পক্ষে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি। আর আমার বিশ্বাস সাধারণ পাঠক সমাজ এই গ্রন্থ থেকে অনায়াসে বিনাক্লেশে সে জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারবেন।

এ গ্রন্থ সাধুভাষায় লিখিত। কিন্তু এ সাধু-ভাষা আজকের দিনে যাকে সাধুভাষা বলে—সে ভাষা নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা যে ভাষার সৃষ্টি করেন, এ সেই ভাষা। এ ভাষা যেমন সরল তেমনি প্রাঞ্জল, যেমন শুদ্ধ তেমনি ভদ্র। এতে সমাস নেই, সন্ধি নেই, সংস্কৃত শব্দের অতি-প্রয়োগ নেই, অপ-প্রয়োগ নেই, দুষ্ট-প্রয়োগ নেই, কষ্ট-প্রয়োগ নেই, বাগাড়ম্বর নেই, বৃথা অলঙ্কার নেই। ফলে এ ভাষা যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি সহজবোধ্য।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, বুদ্ধ-চরিতের তুল্য চমৎকার ও সুন্দর গল্প পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। জনৈক জর্ম্মান পণ্ডিত Oldenburg বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, বুদ্ধচরিত ইতিহাস নয়, কাব্য। এ কথা সত্য। কিন্তু এ কাব্যের মূল্য যে তথাকথিত ইতিহাসের চাইতে শতগুণে বেশী, তা বোঝবার ক্ষমতা জর্ম্মান পাণ্ডিত্যের দেহে নেই। এ কাব্য মানুষের চির-আনন্দের সামগ্রী। অতীতে যে বুদ্ধ-চরিত কোটী কোটী মানবকে মুগ্ধ করেছে, ভবিষ্যতেও তা কোটী কোটি মানবকে মুগ্ধ করবে। এ কাব্যের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য পাণ্ডিত্যের কোনও প্রয়োজন নেই;

যার হৃদয় আছে ও মন আছে, এর সৌন্দর্য্য তার হৃদয়-মনকে স্পর্শ করবেই করবে। যে-দেশে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর যে-দেশের লোকে তাঁর জীবন-চরিত অবলম্বন করে' 'বুদ্ধচরিত' নামক মহাকাব্য রচনা করেছে—সে দেশও ধন্য, সে জাতিও ধন্য। আমি আশা করি, বাঙলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই গ্রন্থ থেকে বুদ্ধ-চরিতের পরিচয় লাভ করে' নিজেদের ধন্য মনে করবেন।

হর্ষ-চরিত

১

বাণভট্ট বলেছেন,—

সাধূনামুপকর্ত্তুং লক্ষ্মীং দ্রষ্টুম্ বিহায়সা গন্তুম্।
ন কুতূহলী কস্থ মনশ্চরিতং চ মহাত্মনাং শ্রোতুম্ ॥

লক্ষ্মীকে দেখবার লোভ আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু সাধু ব্যক্তির উপকার করতে, অথবা মহাপুরুষের জীবনচরিত শুনতে আমাদের সকলেরই সমান কৌতূহল আছে কিনা, বলা শক্ত। আর আকাশে উড়বার সখ আমাদের ক'জনের আছে, জানিনে। যদিচ এই গরুড়যন্ত্রে—ভাষান্তরে aeroplane-য়ের আমলে, নিজের পকেট কিঞ্চিৎ হাল্‌কা করলেই ও-উড়ো-গাড়ীতে অনায়াসে চ'ড়ে হাওয়া খাওয়া যায়। বাণভট্টের যুগে, অর্থাৎ আজ থেকে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের জনগণের "বিহায়সা গন্তুম্"-এর যে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল, এ কথা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

তবে বাণভট্টের সকল কথারই যখন দ্ব্যর্থ আছে, তখন খুব সম্ভবতঃ তিনি বলেছেন যে, মহাত্মার জীবনচরিত শোনা হচ্ছে মনোজগতে মাটী ছেড়ে আকাশে ওঠা,—ইংরাজীতে যাকে বলে higher plane, আমাদের সাংসারিক মনকে সেই ঊর্দ্ধলোকে তোলা।

অপর মহাপুরুষদের বিষয় যাই হোক্, যথা—বুদ্ধদেব অথবা যীশুখৃষ্ট,—বাণভট্ট যে মহাপুরুষের জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ মহারাজ হর্ষ-

বর্দ্ধনের, সে-মহাপুরুষের আখ্যান শোনবার জন্য এ যুগে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর কৌতূহল আছে। কারণ, তিনি নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয় ক'রে উত্তরাপথের সম্রাট্ হয়েছিলেন। এ যুগে আমাদের সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্দুমাত্র নেই ; সুতরাং পুরাকালে যে-যে স্বদেশী রাজা ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী হয়েছিলেন, তাঁদের জীবনচরিত আমরা সকলেই মন দিয়ে শুনতে চাই। পৃথিবীর দাবাখেলায় এখন আমরা বড়ের জাত ; তাই আমরা যদি এ খেলায় কাউকে বাজি মাৎ করতে চাই, সে হচ্ছে বড়ের চালে চালমাৎ। সুতরাং আমাদের জাতের মধ্যেও যে অতীতে রাজা ও মন্ত্রী ছিলেন, এ আমাদের কাছে মহা সুসমাচার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ শ্রেণীর এক-রাটের দর্শন বড় বেশি মেলে না। প্রথম ছিলেন অশোক, তারপর সমুদ্রগুপ্ত, আর শেষ হচ্ছেন হর্ষবর্দ্ধন ;—আর যদি কেউ থাকেন ত তিনি ইতিহাসের বহির্ভূত।

২

দুঃখের বিষয়, এ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কৌতূহল চরিতার্থ করা আমাদের, অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হর্ষ সম্বন্ধে দুজন লোক দু'ভাষায় দু'খানি বই লিখেছেন, এবং সেই দু'খানি বইয়ের উপরই আমাদের হর্ষ-চরিত খাড়া করতে হবে। একটি লেখক হচ্ছেন "হুয়েন সাং" ওরফে ইউয়ান চোয়াং নামক চৈনিক পরিব্রাজক ; এবং দ্বিতীয় লেখক হচ্ছেন বাণভট্ট। চীনে লেখক অবশ্য চীনে ভাষাতেই লিখেছেন, আর বলা বাহুল্য, সে ভাষায় বর্ণপরিচয়

আমাদের কারও হয় নি। ফলে তাঁর গ্রন্থ থেকে হর্ষের ইতিহাস উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।

তারপর বাণভট্টের হর্ষচরিতের অর্থ গ্রহণ করা অসাধ্য না হোক, দুঃসাধ্য,—শুধু আমাদের পক্ষে নয়, পণ্ডিতমহাশয়দের পক্ষেও।

বাঙ্গালাদেশে ১৯৩৯ সংবতে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে মূল হর্ষ-চরিত প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন :—

"বাণভট্ট হর্ষ-চরিত নামে গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না।"

এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, অপর কোন পণ্ডিতই অবগত ছিলেন না। আর বোধহয়, সহজ-বোধ্য নয় বলেই বাঙ্গালার পণ্ডিত-সমাজে এ গ্রন্থের পঠন-পাঠন ছিল না। এ গ্রন্থ যে দুষ্পাঠ্য, তার প্রমাণ, বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও বলেছেন যে, হর্ষচরিতের "অনায়াসে অর্থবোধ জন্মে না।" শুধু বাঙ্গালার পণ্ডিত কেন, অন্য প্রদেশের পণ্ডিতদেরও ঐ একই মত। মহাকবি-চূড়ামণি শঙ্কর, হর্ষ-চরিতের সঙ্কেত নামক যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, তা এই ব'লে শেষ করেছেন—

"দুর্ব্বোধে হর্ষ-চরিতে সম্প্রদায়ানুরোধতঃ।
গূঢ়ার্থোন্মুদ্রণাং চক্রে শঙ্করো বিদুষাং কৃতে॥"

অর্থাৎ হর্ষ-চরিতের ব্যাখ্যাও আমাদের জন্য লেখা হয়নি, লেখা হয়েছিল "বিদুষাং কৃতে"; ফলে এ মহাপুরুষের চরিত "শ্রোতুং" আমাদের কৌতূহল থাকলেও, সে কৌতূহল চরিতার্থ করবার সুযোগ আমাদের ছিল না।

৩

আমাদের মহা সৌভাগ্য এই যে, উক্ত উভয় গ্রন্থই ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হয়েছে, এবং সেই ছ'খানি ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় একখানি নবহর্ষচরিত রচনা করেছেন।

তাঁর রচিত হর্ষ-চরিত আমরা অবলীলাক্রমে পড়তে পারি, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে এ গ্রন্থ রচনা করেননি। বহু পরিশ্রম ক'রে তাঁকে তা' রচনা করতে হয়েছে। প্রথমতঃ বাণভট্টের ইংরাজী তরজমাও সুপাঠ্য নয়। তারপর বাণভট্ট লিখেছিলেন কাব্য, সুতরাং সমস্ত কাব্যখানিই তাঁর মনঃকল্পিত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। কেন না, স্বয়ং বাণভট্টই তাঁর রচিত কাদম্বরীর গোড়াতেই লিখেছেন যে, "অলব্ধ-বৈদগ্ধ্যবিলাসমুগ্ধয়া ধিয়া নিবেদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা।" অর্থাৎ যদিচ তাঁর কোনরূপ বৈদগ্ধ্য ছিল না, তবুও তিনি সখের বশীভূত হয়ে কাদম্বরী নামক "অতিদ্বয়ী" কথা একমাত্র মন থেকে গড়েছেন। 'অতিদ্বয়ী কথা'র অর্থ সেই কথা—যা বাসবদত্তা ও বৃহৎকথাকে অতিক্রম করে। এ হেন চরিত্রের লেখকের কোন কথার উপর আস্থা রেখে ইতিহাস লেখা চলে না, কেন না, ইতিহাসের কথা মন-গড়া কথা নয়। অথচ বাণভট্টের কথা প্রত্যাখ্যান করাও চলে না। কারণ, হর্ষের বালচরিত একমাত্র বাণই বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে রাধাকুমুদ বাবুকে বাণভট্টের প্রতি কথাটি যাচিয়ে নিতে হয়েছে। ইংরাজী ভাষায় যাকে inscription বলে, তাই হচ্ছে ইতিহাসের কষ্টি-পাথর। হর্ষের বিষয়ে inscriptionও আছে; আর সেই সব inscriptionএর সাহায্যে তিনি যাচিয়ে দেখেছেন যে, বাণভট্টের হর্ষ-চরিত অক্ষর-ডম্বর হলেও কেবলমাত্র ধ্বনিসার নয়। তাঁর

প্রায় প্রতি কথাই সত্য, সুতরাং নির্ভয়ে এ-কবির কাব্য ইতিহাসের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। আর হিউয়েন সাংএর কথা যে ইতিহাস, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেন না, তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তকে কোনো হিসাবেই কাব্য বলা চলে না।—ও-গ্রন্থ হচ্ছে একাধারে হিষ্টরি ও জিওগ্রাফি।

৪

রাধাকুমুদ বাবু তাঁর "নব-হর্ষ-চরিত" রচনা করেছেন ইংরাজী ভাষায়; আমি সেই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার বাঙলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করব।

কিন্তু প্রথমেই একটু মুস্কিলে পড়েছি।

সেকালে অজ্ঞাতকুলশীল কোন কবি বলেছেন,—

"হেম্নো ভারশতানি বা মদমুচাং বৃন্দানি বা দন্তিনাং
শ্রীহর্ষেণ সমর্পিতানি গুণিনে বাণায় কুত্রাস্থ তৎ।
যা বাণেন তু তস্য সূক্তিবিসরৈরুট্টঙ্কিতাঃ কীর্ত্তয়-
স্তাঃ কল্পপ্রলয়েঽপি যান্তি ন মনাগ্মন্যে পরিম্লানাম্॥"

(সুভাষিতাবলী—১৮০)

এ শ্লোকের নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, শ্রীহর্ষ বাণভট্টকে যে-ধনদৌলত দিয়েছিলেন, আজ তা কোথায়? অপরপক্ষে বাণভট্ট শ্রীহর্ষের যে কীর্ত্তিকলাপ উট্টঙ্কিত করেছেন, তা কল্পান্তেও ম্লান হবে না।

শ্রীহর্ষ বাণভট্টকে কি সোনারূপো হাতী-ঘোড়া দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। কিন্তু বাণ যে হর্ষের বিশেষ কিছু কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করেছেন, তাও নয়। হর্ষ-চরিত একখানি অদ্ভুত বই। এই

অষ্টাধ্যায়ী ইতিহাসের প্রথম দু' অধ্যায় বাণ-চরিত, আর শেষ দু' অধ্যায় হর্ষ-চরিত। বাণভট্ট রাজসভায় উপস্থিত হয়ে প্রথম এই কথা ব'লে আত্মপরিচয় দেন—"ব্রাহ্মণোঽস্মি জাতঃ সোমপায়িনাং বংশে বাৎস্যায়নো নাম।" তারপর আছে নিজের গুণকীর্ত্তন। এ কবির নিজের আভিজাত্য ও বিদ্যার এতদূর গর্ব্ব ছিল যে, তিনি ঐ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের অনেক অংশ নিজের বংশের ও নিজের কথায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ও-কাব্য থেকে রাজ-চরিত অপেক্ষা কবি-চরিত উদ্ধার করা ঢের বেশী লোভনীয় ও সহজ। কিন্তু সে লোভ এখন আমি সম্বরণ করতে বাধ্য, নইলে হর্ষ চরিত লেখা হবে না। বারান্তরে বাণ-চরিত বর্ণনা করব, কারণ, তা করা আমার আয়ত্তের মধ্যে। বাণ-চরিত লিখতে কোনও চৈনিক গ্রন্থ কিম্বা শিলালিপির সাহায্য নিতে হবে না।

৫

"কথারসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্য চ যোজনা।" এ জ্ঞান সংস্কৃত কবিদেরও ছিল। তবে বাণভট্ট বোধ হয় মনে করতেন যে, হর্ষচরিতের কথায় কোনও রস নেই, তাতে যা কিছু রস আছে, সে তাঁর লেখায়। সুতরাং উক্ত গ্রন্থে কথাবস্তু অতি যৎসামান্য।

অপরপক্ষে রাধাকুমুদ বাবু লিখেছেন ইতিহাস;—সুতরাং বাণভট্টের রচনার ফুল-পাতা বাদ দিয়ে তার কথাবস্তুর উপরই তাঁর হর্ষচরিত রচনা করতে হয়েছে। আর এক কথা; বাণভট্ট যখন হর্ষচরিত শেষ করেছেন, তখন হর্ষের Matriculation দেবারও বয়স হয়নি। সুতরাং সে-চরিতের অন্তরে ঐতিহাসিক মাল অতি কম, আর কাব্যের মশলাই বেশী। অথচ

এ গ্রন্থ উপেক্ষা ক'রে হর্ষচরিতের প্রথম ভাগ লেখা অসম্ভব। আমি রাধাকুমুদ বাবুর পদানুসরণ ক'রে শ্রীহর্ষের বাল্যজীবন বাঙলায় বলব, শুধু বাণভট্টের যে-সব কথা তিনি ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, আমি সে সব যথাসম্ভব বাণভট্টের নিজের কথাতেই বলব। এ কথা শুনে ভয় পাবেন না। হর্ষচরিত অতি দুর্বোধ হ'লেও, বাণভট্ট কাজের কথা অতি সংক্ষেপে সহজবোধ্য সংস্কৃত ভাষাতেই বলেন। তা ছাড়া এ লেখার গায়ে একটু সেকেলে গন্ধও থাকা চাই।

পুরাকালে ভারতবর্ষে শ্রীকণ্ঠ নামে একটি দেশ ছিল, এবং সেই দেশে স্থাণ্বীশ্বর নামক জনপদের রাজবংশে শ্রীহর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। এ বংশ পুষ্পভূতির বংশ ব'লে বিখ্যাত। এই বংশে প্রভাকরবর্দ্ধন নামে একটি রাজা নিজবাহুবলে নানাদেশ জয় ক'রে পরমভট্টারক উপাধি লাভ করেন। তিনি 'প্রতাপশীল' এই অপর নামেও বিখ্যাত। তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঃ—

"হূণহরিণ কেশরী সিন্ধুরাজজ্বরো,
গুর্জ্জর-প্রজাগরঃ গান্ধারাধিপ-গন্ধদ্বিপকুটপাকলঃ
লাট-পাটব-পাটচ্চরঃ মালবলক্ষ্মীলতাপরশুঃ"—

বাণভট্ট এ সব শব্দযোজনা সত্যের খাতিরে কি অনুপ্রাসের খাতিরে করেছেন, বলা কঠিন।

৬

যদিও তাঁর কথা সত্য হয় ত সে-সত্য অনুপ্রাসের ভারে চাপা পড়েছে। প্রভাকরবর্দ্ধন হূনহরিণের কেশরী, সিন্ধুরাজ্যের জ্বর, গুর্জ্জরের

অনিদ্রা, গান্ধাররাজরূপ গন্ধহস্তীর পিত্তজ্বর, লাটচোরের উপর বাটপাড়, ও মালবলক্ষ্মীলতার কুঠার। অর্থাৎ উপরি-উক্ত রাজ্য সব তিনি জয় করুন আর না করুন, ও-সকল রাজ্যের রাজারা তাঁর ভয়ে কম্পান্বিত ছিল। বলা বাহুল্য, এ সব দেশ উত্তরাপথের পশ্চিম-খণ্ড।

শ্রীহর্ষ প্রভাকরবর্দ্ধনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ৫৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাণী যশোবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন তাঁর চাইতে বছর চারেকের বড়, এবং তাঁর ভগ্নী রাজ্যশ্রী বছর দুয়েকের ছোট।

বাণভট্ট কাদম্বরীর রাজকুমার চন্দ্রাপীড় কোথায়, কি কি শাস্ত্রে, কি ভাবে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছিলেন, তার লম্ব বর্ণনা করেছেন; কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে তিনি একেবারে নীরব। শুধু রাজকুমার-দ্বয়ের কে কে অনুচর ছিলেন, সেই কথা বাণ আমাদের বলেছেন।

রাজ্যশ্রীর জন্মের পর প্রভাকরবর্দ্ধন, রাণী যশোবতীর ভ্রাতুষ্পুত্র "ভণ্ডিনামানমনুচরং কুমারয়োরর্পিতবান্।" এই ভণ্ডিই পরে কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি মন্ত্রণাগৃহে, প্রথমে রাজ্যবর্দ্ধনের পরে শ্রীহর্ষের প্রধান সহায় ছিলেন।

কিছুকাল পরে প্রভাকরবর্দ্ধন মালবরাজের পুত্র কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে কুমারদ্বয়ের অনুচর ক'রেছিলেন। এই মাধবগুপ্তই পরে হর্ষবর্দ্ধনের অতি অন্তরঙ্গ সুহৃৎ হন।

কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত যে hostage স্বরূপে প্রভাকরবর্দ্ধনের নিকট রক্ষিত হয়েছিল, এ রকম অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কারণ, প্রভাকর-বর্দ্ধন ছিলেন মালবলক্ষ্মীলতার পরশু।

কিন্তু ভণ্ডি কে ?—তিনি ছিলেন রাণী যশোবতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু যশোবতী কার কন্যা, সে বিষয়ে বাণভট্ট সম্পূর্ণ নীরব ; যদিচ তিনি রাজারাণীদের কুলের খবর বিশেষ ক'রে রাখ্‌তেন।

(৭)

কালক্রমে রাজ্যশ্রী বিবাহযোগ্যা হলেন। যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন তিনি বালিকা কিম্বা কিশোরী, বাণভট্ট সে কথা খুলে বলেন নি। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তার থেকে অনুমান করা যায় যে, একালে সার্দা আইনে সে বিবাহ বাধ্‌ত।

একদিন প্রভাকরবর্দ্ধন, বাহ্যকক্ষস্থ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক গীয়মান বক্ষ্যমাণ আর্য্যাটি শুনলেন—

"উদ্বেগমহাবর্ত্তে পাতয়তি পয়োধরোন্নমনকালে।
সরিদিব তটমনুবর্ষং বিবর্দ্ধমানা সুতা পিতরম্॥"

এই গানটি শোনবামাত্র তিনি যশোবতীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "দেবি তরুণীভূতা বৎসা রাজ্যশ্রী," অতএব আর কালবিলম্ব না ক'রে ওর বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

এর পরেই প্রসিদ্ধ মৌখরী বংশের তিলকস্বরূপ কান্যকুব্জের রাজা অবন্তিবর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রহবর্ম্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হ'ল। এ বিবাহ খুব ঘটা ক'রে দেওয়া হয়েছিল, কেন না, বাণভট্ট খুব ঘটা ক'রে তার বর্ণনা করেছেন। দুঃখের বিষয়, বিবাহ-উৎসব ও বিবাহ-মণ্ডপের সাজসজ্জার বর্ণনা ভাল বোঝা যায় না। বিবাহমণ্ডব "স্ফুরদ্ভিরিন্দ্রায়ুধ-

সহস্রৈরিব সংছাদিতম্।” কিসের দ্বারা?—“ক্ষৌমৈশ্চ বাদরৈশ্চ দুকূলৈশ্চ লালাতন্তুজৈশ্চাংশুকৈশ্চ নেত্রৈশ্চ, নির্মোকনিভৈরকঠোররম্ভা-গর্ভকোমলৈর্নিশ্বাসহার্য্যৈঃ স্পর্শানুমেয়ৈর্বাসোভিঃ।” এ-সব জিনিষ কি? টীকাকার বলেন—বস্ত্রবিশেষ; অভিধানেও এর বেশী কিছু বলে না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত অনুমান করতে পারি যে, “বাদর” খদ্দর নয়, কেন না, বাদরের রূপ ইন্দ্রধনুর, আর তা ফুঁয়ে উড়ে যায়, না হয় ত দেখতে সাপের খোলসের মত; আর অকঠোররম্ভাগর্ভকোমল। সংক্ষেপে এ-সব কাপড় এত মিহি যে, তারা কেবলমাত্র স্পর্শানুমেয়। এ বর্ণনা থেকে এইমাত্র জানা যায় যে, হর্ষযুগের ভারতবর্ষ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দেশ ছিল না। বাণভট্টের হর্ষ-চরিত থেকে রাজারাজড়াদের না হোক, অন্নবস্ত্রের ইতিহাস উদ্ধার করা সহজ।

এর কিছুদিন পরে রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন হূন-পশুদের বধ করবার জন্য রাজ্যবর্দ্ধনকে উত্তরাপথে পাঠিয়েছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনও হিমালয়ের উপকণ্ঠে বাঘভালুক শিকার করতে গেলেন। বলা বাহুল্য যে, হর্ষদেব “স্বল্পীয়োভিরেব দিবসৈর্নিঃশ্বাপদান্তরণ্যানি চকার”।

এমন সময়ে তিনি খবর পেলেন যে, প্রভাকরবর্দ্ধন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন, এবং পরদিনই তাঁর পিতার মৃত্যু হ'ল, ও রাণী যশোবতী সহমরণে গেলেন।

তারপর রাজ্যবর্দ্ধন দেশে ফিরে এসে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন; কারণ, পূর্ব্ব হতেই সংসার ত্যাগ করবেন ব'লে তিনি মনস্থির করেছেন, উপরন্তু পিতৃশোক তাঁকে একান্ত কাতর ক'রে ফেলেছে। রাজ্যবর্দ্ধন স্পষ্টই বললেন যে, “স্ত্রিয়ো হি বিষয়ঃ

শুচাম্। তথাপি কিং করোমি। স্বভাবস্থ বেয়ং কাপুরুষতা বা স্ত্রৈণং বা যদেবমাস্পদং পিতৃশোকহুতভুজো জাতোহস্মি।”

কিন্তু হর্ষ কিছুতেই বড় ভাইকে টপ্‌কে সিংহাসনে চ'ড়ে বসতে সম্মত হলেন না।

(৮)

শোকবিমূঢ় ভ্রাতৃদ্বয় কিংকর্ত্তব্য স্থির করতে পারছেন না, এমন সময় রাজ্যশ্রীর সংবাদক নামক পরিচারক এসে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলে—

“যেদিন অবনিপতির মৃত্যুর সংবাদ এল, সেই দিনই দুরাত্মা মালবরাজ গ্রহবর্ম্মাকে বধ ক'রে রাজ্যশ্রীর পায়ে বেড়ি পরিয়ে কান্যকুব্জের কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।” এ-সংবাদ শুনে রাজ্যবর্দ্ধনের হৃদয়ে শোকাবেগের পরিবর্ত্তে রোষাবেগ স্থান লাভ করলে, ও তিনি হর্ষকে সম্বোধন ক'রে বললেন ঃ—

“এ রাজ্য তুমি পালন করো। আমি আজই মালবরাজকুলের ধ্বংসের জন্য যাত্রা করছি। একমাত্র ভণ্ডি দশ সহস্র অশ্ব-সৈন্য নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।”

হর্ষও এ কথা শুনে বল্লেন, “আমিও তোমার অনুগমন করতে প্রস্তুত—যদি বাল ইতি তর্হি ন ত্যজ্যোহস্মি। অশক্ত ইতি ক্ব পরীক্ষিতোহস্মি।” কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধন এ পরীক্ষা করতে স্বীকৃত হলেন না, বালক হর্ষকে ত্যাগ ক'রে একাই যুদ্ধযাত্রা করলেন।

এর ক'দিন পরেই কুন্তল নামক অশ্ববার এসে সংবাদ দিলে যে,

রাজ্যবর্দ্ধন মালব-সৈন্যের উপর জয়লাভ করবার পর "গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রমেকাকিনং বিস্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতম্।"

ঐ গৌড়াধিপের নাম শশাঙ্ক। এ সংবাদ শুনে প্রভাকরবর্দ্ধনের বৃদ্ধ সেনাপতি হর্ষকে বললেন ঃ—

"কিং গৌড়াধিপেনৈকেন। তথা কুরু যথা নান্যোঽপি কশ্চিদাচরত্যেবং ভূয়ঃ।"

হর্ষদেব উত্তর করলেন, "শ্রূয়তাং মে প্রতিজ্ঞা", "পরিগণিতৈরেব বাসরৈর্নির্গৌড়াং করোমি মেদিনীম্।" তারপর অবন্তি নামক মহাসন্ধিবিগ্রহকারককে আদেশ করলেন যে, উদয়াচল হ'তে অস্তগিরি পর্য্যন্ত সকল দেশের সকল রাজাদের কাছে এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র পাঠাও যে, "সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং সজ্জীক্রিয়ন্তাং করাঃ করদানায় শস্ত্রগ্রহণায় বা।" এর পরেই তিনি "মান্ধাতা-প্রবর্ত্তিত" দিগ্বিজয়ের পথ অবলম্বন করলেন।

(৯)

হর্ষদেব হাতী-ঘোড়া লোক-লস্কর নিয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হবেন, এমন সময়—"ভণ্ডিরেকেনৈব বাজিনা কতিপয়-কুলপুত্রপরিবৃতো রাজদ্বারমাজগাম।" ভণ্ডির পরিধানে মলিন বাস আর সর্ব্বাঙ্গ শত্রুশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। হর্ষ ভণ্ডির কাছে ভ্রাতৃমরণ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন এবং ভণ্ডিও আগাগোড়া সকল কথা বললেন। তারপর নরপতি জিজ্ঞাসা করলেন,—"রাজ্যশ্রীর অবস্থা কি?" ভণ্ডি উত্তর করলেন, "রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর দেবী রাজ্যশ্রী কুশস্থলে গুপ্ত কর্ত্তৃক গৃহীত হন, পরে বন্ধন থেকে

মুক্ত হয়ে সপরিবারে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করেছেন, এ কথা আমি লোকমুখে শুনেছি, এবং তাঁর খোঁজে বহু লোক পাঠিয়েছি ; কিন্তু তারা কেউ ফিরে আসেনি।"

এ কথা শুনে হর্ষ বললেন,—"অন্য লোকের কি প্রয়োজন? অন্য কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে যেখানে রাজ্যশ্রী আছেন, সেখানে স্বয়ং আমি যাব, আর তুমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গৌড়াভিমুখে গমন করো।"

এর পর হর্ষ মালবরাজকুমার মাধবগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করলেন, এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষু দিবাকর মিত্রের আশ্রমে রাজ্যশ্রীর সাক্ষাৎ পেলেন। যখন হর্ষ দিবাকর মিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হলেন, তখন রাজ্যশ্রী চিতায় প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন। হর্ষ ও দিবাকর মিত্র তাঁকে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত করলেন। রাজ্যশ্রী বৌদ্ধভিক্ষুণীর ধর্ম্মে দীক্ষিত হবার জন্য দিবাকর মিত্রের কাছে প্রার্থনা জানালেন। দিবাকর মিত্র সে প্রার্থনা মঞ্জুর করতে স্বীকৃত হলেন না, দু' কারণে। প্রথমতঃ রাজ্যশ্রীর বয়েস অল্প, দ্বিতীয়তঃ সে শোকগ্রস্ত। তারপর হর্ষ যখন ভগ্নীকে কথা দিলেন যে, তিনিও ভ্রাতৃমরণের প্রতিশোধ নিয়ে পরে কাষায়বসন ধারণ করবেন, তখন রাজ্যশ্রী সে ক'টা দিন অপেক্ষা করতে স্বীকৃত হলেন।

এইখানেই বাণভট্টের হর্ষ-চরিত শেষ হ'ল।

(১০)

বাণভট্ট যে কেন এইখানেই থামলেন, তা আমাদের অবিদিত, এবং তা জানবারও কোনও উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু নানারূপ

অনুমান করতে পারি, কিন্তু সে সব অনুমানের হর্ষচরিতে কোন অবসরও নেই, সার্থকতাও নেই। তবে যে কারণেই হোক্, তিনি যে আট অধ্যায়কে অষ্টাদশ অধ্যায় করেন নি, এ আমাদের মহা সৌভাগ্য। কারণ, ও-ধরণের লেখা এর বেশী আর পড়া অসাধ্য। ইংরাজীতে বলে —Life is short ; সুতরাং art যদি অতি লম্বা হয় ত এক জীবনে তার চর্চ্চা ক'রে ওঠা যায় না।

সে যাই হোক্, বাণভট্ট history লেখেন নি, লিখেছেন হর্ষের biography। জীবনচরিত লেখবার আর্ট একরকম portrait painting এর আর্ট। এ আর্টের বিষয় বাহ্য ঘটনা নয়। এর একমাত্র বিষয় হচ্ছে—একটি মানুষ। মানুষের বাইরের চাইতে অন্তরই জীবনচরিত-লেখকের মনকে বেশী টানে। ফলে এর থেকে সেকালের রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব।

হর্ষ যে দিগ্বিজয় করেছিলেন, তার প্রমাণ তিনি "সকল উত্তরা-পথেশ্বর" হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দিগ্বিজয়ের বিবরণ হর্ষ-চরিতে নেই, হিউয়েন সাংএর ভ্রমণবৃত্তান্তেও নেই।

হর্ষচরিত থেকে আমরা এইমাত্র জানতে পাই যে, প্রভাকরবর্দ্ধন লাট, সিন্ধু, গান্ধার ও মালবদেশের রাজাদের শত্রু ছিলেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই মালবরাজ কান্যকুব্জ আক্রমণ ক'রে গ্রহবর্ম্মাকে বধ করেন। কিন্তু এ মালবরাজ যে কে, হর্ষচরিতে তাঁর নাম নেই। ভণ্ডি বলেছেন, "গুপ্তনাম্না,"—এর বেশী কিছু নয়।

রাধাকুমুদ বাবু প্রমাণ পেয়েছেন, এ গুপ্ত হচ্ছে দেবগুপ্ত, এবং তিনি ছিলেন হর্ষের সহচরদ্বয় মাধবগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাজ্য-

বর্দ্ধন এঁকে পরাভূত ক'রে কান্যকুব্জরাজ্য উদ্ধার করেন, এবং হর্ষ এই ভগ্নীপতির সিংহাসন অধিকার করেন।

১১

এখন এই "ভণ্ডি" নামক ব্যক্তিট কে? তিনি যে হর্ষবর্দ্ধনের প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর যখন অপরাপর মন্ত্রীরা হর্ষকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করতে ইতস্ততঃ করছিলেন, তখন ভণ্ডির পরামর্শেই তাঁরা বালক হর্ষকে রাজা করেন। মালবরাজের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্দ্ধন যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন ভণ্ডিই দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তাঁর অনুগমন করেন এবং সে-যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ভণ্ডিই হর্ষের আদেশে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান। সুতরাং তিনিই যে হর্ষদেবের friend, philosopher and guide ছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই কারণেই ভণ্ডি লোকটি কে জানবার জন্য কৌতূহল হওয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক।

বাণভট্ট এইমাত্র বলেছেন যে, ভণ্ডি যশোবতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু যশোবতী যে কার কন্যা ও কার ভগ্নী, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব।

রাধাকুমুদ বাবু বলেন যে, যশোবতী হূনারি যশোধর্ম্মণের কন্যা। যশোধর্ম্মণ্ যে-সে রাজা নন। হূনরাজ মিহিরকুলকে যুদ্ধে পরাভূত ক'রে, তিনি ভারতবর্ষের সম্রাট হন। যশোবতী এ-হেন রাজচক্রবর্ত্তীর কন্যা হ'লে বাণভট্ট সে-কথা গোপন করতেন না। আর যশোধর্ম্মণের পুত্র শিলাদিত্যই নাকি ভণ্ডির পিতা, যে রাজার বিরুদ্ধে ল'ড়ে ভণ্ডি ও

রাজ্যবর্দ্ধন জয়লাভ করেন। রাধাকুমুদ বাবু যা বলেছেন, তা হ'তে পারে। কিন্তু এ বংশাবলী আঁকে মেলে না। যশোধর্ম্মণ হূন নিপাত করেছিলেন ৫২৮ খৃষ্টাব্দে, আর হর্ষের জন্ম হয় ৫৯০ খৃষ্টাব্দে; সুতরাং বিয়ের সময়ে যশোবতীর বয়েস কত ছিল? সেকালে রাজারাজড়াদের ঘরের মেয়েদের কোন্ বয়সে বিয়ের ফুল ফুটত, তা রাজ্যশ্রীর বিবাহ থেকেই জানা যায়। সুতরাং ভণ্ডি যে যশোধর্ম্মনের পৌত্র, এ অনুমান প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।

১২

তারিখ না থাক্‌লে ইতিহাস হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা একরকম অসম্ভব, কারণ সংস্কৃত সাহিত্য তারিখছুট। সেই জন্যই আমাদের দেশের কোন ব্যক্তির অথবা কোন ঘটনার তারিখ জানতে হ'লে বিদেশে যেতে হয়। চীনে লেখকদের গুণ এই যে, তাঁদের সকলেরই মহাকালের না হোক, ইহকালের জ্ঞান ছিল। ভাগ্যিস্ হিউয়েন সাং এ দেশে এসেছিলেন, তাই আমরা হর্ষবর্দ্ধনের সঠিক কালনির্ণয় করতে পারি। উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে ও কতকটা inscriptionএর সাহায্যে আমরা জানি যে, হর্ষ জন্মেছিলেন ৫৯০ খৃষ্টাব্দে, রাজা হয়েছিলেন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে, আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে।

তারিখ বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না, একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস ছাড়া। কিন্তু তাই ব'লে ইতিহাস মানে প্রাচীন পঞ্জিকামাত্র নয়; এমন কি, রাজরাজড়ার জীবনচরিতও নয়। আমরা একটা বিশেষ দেশের, বিশেষ কালের, বিশেষ সমাজের মতিগতি সব জান্‌তে চাই।

কিন্তু সে জ্ঞান লাভ করবার মালমশলা হর্ষচরিতেও নেই, হিউয়েনসাংএর ভ্রমণবৃত্তান্তেও নেই। রাধাকুমুদ বাবু হর্ষচরিত লিখেছেন Rulers of India নামক seriesএর জন্য। সুতরাং হর্ষের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁকে একটি পূরো অধ্যায় লিখতে হয়েছে। কিন্তু এ অধ্যায়টি তাঁকে এই অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে যে, হর্ষযুগের রাজশাসন, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তযুগের অনুরূপ; সুতরাং তিনি এ বিষয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা গুপ্তযুগের বিবরণ—যদিও হর্ষের রাজ্য গুপ্তরাজ্যের মত নিরুপদ্রব ছিল না। হিউয়েনসাংকে বহুবার চোর-ডাকাতের হাতে পড়'তে হয়েছিল, কিন্তু Fa-Hienএর কেউ কেশস্পর্শ করেনি। হর্ষের পূর্ব্বে দেশ অরাজক হয়ে পড়েছিল, আর হর্ষের মৃত্যুর পর আবার অরাজক হয়েছিল। ইতিমধ্যে যে তিনি দেশকে সম্পূর্ণ সুশাসিত করতে পারেননি, এতে আর আশ্চর্য্য কি?

১৩

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, রাধাকুমুদ বাবু তাঁর "হর্ষচরিত" লিখেছেন—"Rulers of India" নামক ইংরাজী seriesএর দেহ পুষ্ট করবার জন্য। এ seriesএর নামাবলী প'ড়ে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা কখনও ভারতবাসী হয় না, হয় শুধু বিদেশী। একমাত্র অশোক এ দলে স্থানলাভ করেছেন। ফলে অশোক যে বিদেশী, তাই প্রমাণ করতে এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা উঠে প'ড়ে লেগেছেন। রাধাকুমুদ বাবু হর্ষকেও এই ছত্রপতি রাজাদের দলভুক্ত করেছেন। সুতরাং দুদিন পরে হয় ত শুনব যে, অশোক যেমন পারসিক, হর্ষ তেমনি হূন। হর্ষের মাতুলপুত্র হচ্ছেন

ভণ্ডি, এবং হূন ভাষার পণ্ডিতরা বলেন যে, ভণ্ডি নাম হূন নাম। তা যদি হয় ত হর্ষের মাতৃকুল যে হূন-কুল, এ অনুমান করা ঐতিহাসিক পদ্ধতি-সঙ্গত।

যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষ তিনজনই স্বদেশী রাজা ছিলেন, তাহ'লে এ তিনজন যে কি ক'রে রাজা থেকে মহারাজাধিরাজ হয়ে উঠলেন, তার একটা হিসেব পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ চিরকালই নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে Unitary government, এত প্রকাণ্ড দেশে সে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্বাভাবিক নয়। যখনই কোন প্রবল বিদেশী শত্রুর হাত থেকে ভারতবাসীদের পক্ষে আত্মরক্ষা করবার প্রয়োজন হয়েছে, এবং যে রাজা সে বহিঃশত্রুর কবল থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন, তখনই তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের না হোক্, উত্তরাপথের সম্রাট হয়েছেন। গ্রীক-সম্রাট আলেকজান্দারের ভারতবর্ষের ব্যর্থ আক্রমণের অব্যবহিত পরেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অশোক হচ্ছেন তাঁর পৌত্র। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত শকারি-বিক্রমাদিত্য। এবং যেকালে দেশ থেকে হূন-পশু বহিষ্কৃত হয়, সেই কালেই হর্ষবর্দ্ধন সকল উত্তরাপথেশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। যবনদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করবার জন্য মৌর্য্য বংশের প্রতিষ্ঠা। শকদের কবল থেকে পশ্চিমভারত উদ্ধার করবার ফলেই গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা। আর হূন-হরিণ-কেশরী ব'লেই হর্ষ দেশের পরমেশ্বর হয়েছিলেন। অর্থাৎ একমাত্র বিদেশীই ভারতবর্ষের ruler হয় না—বিদেশীর হাত থেকে যে

দেশরক্ষা করতে পারে, সেও সেকালে ভারতবর্ষের ruler হতো। মেধাতিথি আর্য্যাবর্ত্ত নামক দেশের এই ব'লে পরিচয় দিয়েছেন :—

"আর্য্যা বর্ত্তন্তে তত্র পুনঃ পুনরুদ্ভবন্ত্যাক্রম্যাপি ন চিরং ম্লেচ্ছা তত্র স্থাতারো ভবন্তি।" এই উত্থানপতনের ইতিহাসই ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস।

১৪

বাণভট্ট হূনদের বরাবর "হূন-হরিণী" ব'লে এসেছেন; কিন্তু তারা ঠিক হরিণ-জাতীয় ছিল না,— না রূপে, না গুণে। হূনরা ছিল হিংস্র বনমানুষ। Vincent Smith বলেন :—

"Indian authors having omitted to give any detailed description of the savage invaders who ruthlessly oppressed their country for three quarters of a century, recourse must be had to European writers to obtain a picture of the devastation wrought and the terror caused to settled communities by the fierce barbarians."

হূন নামক যে ঘোর নৃশংস বর্ব্বর জাতি পঞ্চম শতাব্দীতে য়ুরোপের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, সেই জাতিরই একটি বিশেষ শাখা পারস্যদেশ ও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। সুতরাং য়ুরোপের লোক তাদের যে বর্ণনা করেছে, তার থেকে আমরা হূনদের রূপগুণের পরিচয় পাই। Smith বলেন,—

The original accounts are well summarised by Gibbon :—

"The numbers, the strength, the rapid motions and the implacable cruelty of the Huns, were felt and dreaded and magnified by the astonished Goths, who beheld their fields and villages consumed with flames and deluged with indiscriminate slaughter. To these real terrors. they added the surprise and abhorrence which were excited by the shrill voice, the uncouth gestures, and the strange deformity of the Huns. They were distinguished from the rest of the human species by their broad shoulders, flat noses and small black eyes, deeply buried in their head ; and as they were almost destitute of beards, they never enjoyed the manly graces of youth or the venerable aspect of age."

যে হূনরা য়ুরোপ আক্রমণ করেছিল, তাদেরই জাতভাইরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল, সুতরাং রূপে ও চরিত্রে তারা যে পূর্ব্বোক্ত হূনদের অনুরূপ ছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তারা যে ঘোর অসভ্য ও ঘোর নৃশংস নরপশু, শুনতে পাই এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যও সাক্ষ্য দেয়।

এ দেশে যাঁরা আসেন, য়ুরোপীয়রা তাঁদের White Huns বলেন ; কি কারণে, তা জানিনে। কিন্তু তাঁরা যে কৃষ্ণকায় ছিলেন না, তার প্রমাণ বক্ষ্যমাণ সংস্কৃত পদে পাওয়া যায়।

"সদ্যোমুণ্ডিতমত্তহূনচিবুকপ্রস্পর্দ্ধি নারঙ্গকম্।"

এ উপমা থেকে এই জানা যায় যে হূনের রং ছিল হল্‌দে, ও তাদের চিবুক ছিল almost destitute of beards। কারণ, তাদের যে নামমাত্র দাড়ি ছিল, তা কামালে মাতাল হূনের চিবুক নারঙ্গের রূপ ধারণ করত।

এই কিম্ভূতকিমাকার জাতির আচার-ব্যবহারও অতিশয় কদর্য্য ছিল। হিন্দুর মত শুদ্ধাচারী জাতির পক্ষে এ কারণেও হূন জাতি অসহ্য হয়েছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং হূনদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভারতবাসীদের পক্ষে একটা মারাত্মক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হবার স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষকে এ রোগের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাঁকে যে দেশের লোক মহাপুরুষ ব'লে গণ্য করবে, এতে আশ্চর্য্য কি ?

১৫

ভারতবর্ষ সেকালে ছিল নানা রাজার দেশ। সুতরাং রাজায় রাজায় যুদ্ধ ছিল সেকালে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু কোন রাজা কাকে মারলে তাতে সমাজের বেশি কিছু যেত আসত না। মনুর বিধান আছে, যে,—

"জিত্বা সম্পূজয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্ম্মিকান্।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ॥
সর্ব্বেষাস্তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতম্।
স্থাপয়েৎ তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাৎ চ সময়ক্রিয়াম্॥"

(মনু ৭ অধ্যায় ২০১, ২০২ শ্লোক)

উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ের মেধাতিথিকৃত ভাষ্যানুবাদ :—

বিজয়ী রাজা পররাজ্য জয় করবার পর পুরী ও জনপদের প্রশমন ক'রে, তত্রস্থ দেবদ্বিজ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের রণার্জ্জিত ধনের চতুর্থাংশ ও ধূপদীপ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করবেন। তারপর সে দেশের গৃহস্থ ব্যক্তিরা যাতে কোনরূপ কষ্টে না পড়ে, তজ্জন্য তাদের এক বৎসর কিম্বা দু'বৎসরের কর ও শুল্করূপ ভার থেকে মুক্তি দেবেন,—যাতে তাদের জীবনযাত্রার কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়। তারপর নগরের ও জনপদের অভয়দান করবেন, অর্থাৎ ডিণ্ডিম প্রভৃতির দ্বারা ঘোষণা করবেন যে, যারা পূর্ব্বস্বামীর প্রতি অনুরাগবশতঃ আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের আমি ক্ষমা করলুম, তারা যেন নির্ভয়ে স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

বিজিতরাজ্যের জনসাধারণকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে শান্ত ও সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেও বিজয়ী রাজা যদি জানতে পান যে, সে রাজ্যের প্রজাদের পূর্ব্বস্বামীর উপর অনুরাগ অতি প্রবল, এবং তারা কোন নূতন রাজা ও রাজশাসন চায় না, তাহ'লেও তিনি সংক্ষেপে প্রজাদের মনোভাবের বিষয় অবগত হয়ে সেই বংশের অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এবং তদ্দেশের সমবেত প্রজামণ্ডলী ও রাজপুরুষদের সম্মতিক্রমে ও তাদের সমক্ষে সেই নব-অভিষিক্ত রাজার সঙ্গে এই মর্ম্মে সন্ধি করবেন যে, "তোমার আয়ের অর্দ্ধেক আমি পাব, এবং তুমি আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সকল বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করবে; আর আমি যদি দৈবক্রমে এবং অকারণে বিপদ্‌গ্রস্ত হই, তুমি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তোমার অর্থ ও বলের দ্বারা আমার সাহায্য করবে।"—

মনুর বিধান Law নয়, Custom; সমাজে যা ঘটত, তারই বিবরণ।

সুতরাং সেকালে জয়-পরাজয়ের ফলে রাজা বদলালেও রাজ্য বদলাত না।

অপরপক্ষে শক, যবন, হূন প্রভৃতির আক্রমণে সমগ্র সমাজ যুগপৎ বিপর্য্যস্ত ও নিপীড়িত হ'ত। কারণ, এই বিদেশী শত্রুরা দেবদ্বিজ, রাজা-প্রজা কারও মর্য্যাদা রক্ষা করতেন না, সকলেরই উপর সমান অত্যাচার করতেন। সুতরাং হূন প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুধু রাজার যুদ্ধ নয়, রাজা-প্রজা উভয়ের মিলিত আত্মরক্ষার প্রয়াস। এ অবস্থায় যখনই হিন্দুরা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে, তখনই তাদের আনন্দ আর্টে, সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। হিন্দু-প্রতিভা পরবশ হলেই নিদ্রিত হয়ে পড়ে, আত্মবশ হলেই আবার জাগ্রত হয়।

অশোকের যুগ ভারতবর্ষের স্থাপত্য-শিল্পের যুগ। গুপ্তযুগ কালিদাসের কাব্যের ও অজন্তাগুহার চিত্রশিল্পের যুগ। আর হর্ষের যুগ কাদম্বরী ও ভর্তৃহরি-শতকের যুগ।

প্রাচীন ভারতের এই চক্রবর্ত্তী মহারাজরা সত্যসত্যই মহাপুরুষ ছিলেন। কারণ, তাঁরা একমাত্র যোদ্ধা ছিলেন না, দেশের সকলপ্রকার গুণীর তাঁরা গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন, এবং তাঁদের সাহায্যেই দেশের কাব্য, আর্ট প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্দ্ধন নিজেরাও আর্টিষ্ট ছিলেন। হর্ষ দেশের ধর্ম্ম ও সাহিত্যকে যে কতদূর বাড়িয়ে তুলেছিলেন, তার পরিচয় রাধাকুমুদ বাবুর পুস্তকে সকলেই পাবেন।

পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলী খাঁ

১

আমার বিশ্বাস, নবাবী আমলের বঙ্গসাহিত্যের অন্তর থেকে অনেক ছোটখাট ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করা যায়। বলা বাহুল্য, সত্য মাত্রেই ঐতিহাসিক সত্য নয়, যেমন fact মাত্রেই scientific fact নয়। সত্যেরও একটা জাতিভেদ আছে।

ইতিহাসেরও একটা Evidence Act আছে। যে ঘটনা উক্ত আইনের বাঁধাধরা নিয়মের ভিতর ধরা না পড়ে, সে ঘটনা যে সত্য—এ কথা ইতিহাসের আদালতে গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং যে-ঘটনা আমরা মনে জানি সত্য, তা যে ঐতিহাসিক সত্য, এমন কথা মুখ ফুটে বলবার সাহস পাই নে, রীতিমত দলিলদস্তাবেজের অভাবে।

আর বাংলা সাহিত্যে যে সুধু ছোটখাট ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তার কারণ সেকালে কোন বাঙালী ইতিহাস লেখেন নি, লিখ্‌তে চেষ্টাও করেন নি। প্রসঙ্গতঃ এখানে-ওখানে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যার গায়ে সত্যের স্পষ্ট ছাপ আছে। আর আমার বিশ্বাস যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে ছোটবড়র বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই। সত্যের যদি কোন মূল্য থাকে, ত সে মূল্য ছোটর অন্তরেও আছে, বড়র অন্তরেও আছে। সুতরাং সেকেলে বঙ্গসাহিত্যের অন্তরে যে-সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলি তুচ্ছ ব'লে উপেক্ষা করবার জিনিষ নয়।

চৈতন্যচরিতামৃতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যে অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে ঘটনা যে প্রকৃত, কবিকল্পিত নয়, এই আমার চিরকেলে ধারণা। এবং এর ফলে, যাঁরা ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন, উক্ত ঘটনাটির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। পূর্ব্বে যে করিনি, সে কতকটা আলস্য ও কতকটা সঙ্কোচবশতঃ। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল উক্ত ঘটনা অবলম্বন ক'রে 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

তিনি বলেন যে, তাঁরও বিশ্বাস ও গল্পটি বৈষ্ণবদের কল্পিত নয়, সত্য ঘটনা। আমরা যদি সে যুগের ইতিহাসের অন্তর থেকে পাঠান-বৈষ্ণব বিজুলী খাঁকে বা'র করতে পারি, তাহ'লে কবিরাজ গোস্বামীবর্ণিত বিবরণ যে সত্য সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। উক্ত কারণেই শীল মহাশয় বিজুলী খাঁর পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, চৈতন্যচরিতামৃতে যাঁকে বিজুলী খাঁ বলা হয়েছে, তাঁর প্রকৃত নাম আহম্মদ খাঁ। আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস, চৈতন্যের যুগে "বিজুলী খাঁ" নামে একটি স্বতন্ত্র ও স্বনামখ্যাত রাজকুমার ছিলেন, এবং কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁরই কথা বলেছেন। কি কারণে আমার মনে এ ধারণা জন্মেছে, সেই কথাটাই এ প্রবন্ধে বল্‌তে চাই।

২

চৈতন্যচরিতামৃত হ'তে যদি সমগ্র বর্ণনাটি পাঠকদের চোখের সুমুখে ধ'রে দিতে পারতুম, তাহ'লে ঘটনাটি যে কত অদ্ভুত তা সকলেই দেখ্‌তে পেতেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের ভিতর তার অবসর নেই, কারণ বর্ণনাটি

একটু লম্বা। তা ছাড়া যিনি ইচ্ছা করেন তিনিই চৈতন্যচরিতামৃতে তা দেখে নিতে পারেন। আমি সংক্ষেপে এবং যতদূর সম্ভব কবিরাজ মহাশয়ের জবানিতেই, ব্যাপার কি হয়েছিল বলবার চেষ্টা করব। কারণ ঘটনাটি না জানলে, তার বিচার পাঠকদের মনে লাগবে না। ঘটনাটি অদ্ভুত হলেও যে মিথ্যা নয়, এবং একেবারে বিচারসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য—তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। সকলেই মনে রাখবেন যে ঐতিহাসিক সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নয়! অতীতে যা একবার ঘটেছিল, তা পৃথিবীতে আর দু'বার ঘটে না। ইংরাজীতে যাকে বলে, historical fact, তার repetition নেই। আর যে-জাতীয় ঘটনা বার-বার ঘটে এবং ঘটতে বাধ্য—সেই জাতীয় ঘটনা নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার। সুতরাং ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা যাকে প্রমাণ বলি, তা অনুমান মাত্র।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন অঞ্চলে তীর্থভ্রমণ ক'রে দেশে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন, তখন একদিন পথশ্রান্তি দূর করবার জন্য একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নেন। তাঁর সঙ্গী ছিল তিনটি বাঙালী শিষ্য আর দুটি হিন্দুস্থানী ভক্ত; একজন রাজপুত, অপরটি মাথুর ব্রাহ্মণ। এ দুই ব্যক্তিকেই তিনি মথুরাতে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি গাছতলায় বসে আছেন এমন সময়—

"আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনিতেই মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেন পড়ে, নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হৈলা॥

হেনকালে তাহাঁ আসোয়ার দশ আইল।
ম্লেচ্ছ-পাঠান, ঘোড়া হৈতে উত্তরিল॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে, যতির সব ধন নেয়া॥
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিলা।
কাটিস্তে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিলা॥”

এর থেকে বোঝা যায় যে, ভয় জিনিষটে আমরা বিলেত থেকে আমদানী করিনি। বাঙালী তিনজন ভয়ে কাঁপতে লাগলেন দেখে মহাপ্রভুর হিন্দুস্থানী ভক্ত দু'জন তাঁদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। কারণ

“সেই কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়
সেইত মাথুর বিপ্র মুখে বড় দড়।”

সেই “মুখে বড় দড়” ব্রাহ্মণ পাঠান আসোয়ারদের বললেন—

এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েত মূৰ্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাবে হইবে সম্বিত॥
ক্ষণেক ইহাঁ বৈস, বান্ধি রাখ সবাকারে।
ইহাঁকে পুছিয়া তবে মারিহ সবারে॥

একথা শুনে,

“পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা, সাধু দুই জন।
গৌড়ীয়া ঠগ্ এই কাঁপে তিন জন॥

বাঙালী বেচারারা ভয়ে কাঁপছে, তার থেকে প্রমাণ হ'ল তারাই মহাপ্রভুকে খুন করেছে। একালেও আদালতে demeanour থেকে অপরাধের প্রমাণ হয়। সুতরাং সে তিন বেচারার হাতে হাতে প্রাণদণ্ড দেওয়াই স্থির হ'ল। এক্ষেত্রেও উক্ত গোবেচারাদের প্রাণরক্ষা করলেন, সেই নির্ভীক রাজপুত বৈষ্ণব।

কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুড়কী আছে শতেক কামানে॥
এখনি আসিবে যদি আমি ত ফুকারী।
ঘোড়া পিড়া লবে সব, তোমা সবা মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুঠ আর চাহ মারিবার॥
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ বড় হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥

এর পর পাঠানদের মধ্যে যে একজন পীর ছিলেন, তার সঙ্গে মহাপ্রভুর শাস্ত্রবিচার সুরু হয়, এবং সে বিচারে পরাস্ত হয়ে পীর সাহেব মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং

"রামদাস বলি প্রভু তাঁর কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলি খাঁন॥
অল্প বয়স তার, রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥

কৃষ্ণ বলি সেই পড়ে মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥”

এই হচ্ছে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পীর ও প্রভুর শাস্ত্রবিচারের পরিচয় পরে দেব; কারণ সে-বিচার অতি বিস্ময়জনক। তারপর কি কারণে রাজকুমার বিজুলী খাঁনকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করি তা বলব। প্রথমে এরকম ঘটনা ঘটা যে সম্ভব, তাই দেখাবার জন্য দেশ-কালের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

২

শীল মহাশয় অনুমান করেন যে, মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন অঞ্চলে তীর্থ ভ্রমণে যান, তখন সিকন্দর লোদি দিল্লীর পাতশা, এবং আগ্রা ছিল তাঁর রাজধানী। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর লোদির মৃত্যু হয়। সুতরাং চৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লিখিত ঘটনা সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ঘটে। আমার বিশ্বাস, এ অনুমান সঙ্গত। কবিরাজ গোস্বামীর কথা মেনে নিলেও ঐ তারিখই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে মহাপ্রভুর—

“মধ্যলীলার করিল এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর কৈলে যৈছে গমনাগমন ॥
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তন উল্লাস ॥”

—চৈতন্যচরিতামৃত, ২৫ পরিচ্ছেদ, ১৮৫ শ্লোক।

এখন ঐতিহাসিকদের মতে চৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং তার কিছুদিন পরেই তীর্থ-পর্য্যটনে

বহির্গত হন। ঠিক কতদিন পরে তা আমরা জানিনে। যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে তাঁর "গমনাগমন" সুরু হয় ১৫১০ খৃষ্টাব্দে, তাহ'লে তিনি কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের হিসেবমত ১৫১৬ সালে "মথুরা হইতে প্রয়াগ গমন" করেন। অপর পক্ষে তাঁর মৃত্যুর আঠার বৎসরের আগের হিসেব ধরলেও ঐ একই তারিখে পৌছানো যায়, কারণ মহাপ্রভুর তিরোভাবের তারিখ হচ্ছে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ।

সিকন্দর লোদি ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের মারাত্মক শত্রু। উক্ত পাতশার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কথা-কটি হ'তে পাওয়া যাবে।

"The greatest blot on his character was relentless bigotry. The wholesale destruction of temples was not the best method of conciliating the Hindus of a conquered district."

(*Cambridge History of India*, Vol. 3, p. 246)

চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন সে দেশে যে দেবমন্দির ও বিগ্রহাদির ধ্বংসলীলা চলছিল, তা চৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হতেই জানা যায়। মহাপ্রভু অতিকষ্টে গোপালজীর দর্শনলাভ করেন। কারণ,

"অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥
একজন আসি রাত্র্যে গ্রামিকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুক ধারি সাজিল॥

আজ রাত্র্যে পলাহ, গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লয়া ভাগ, আসিবে কাল যবন॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইলা।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠলি গ্রামে থুইলা॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃত সেবন।
গ্রাম উজার হৈল, পালাইল সর্ব্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কভু গ্রামান্তরে॥

পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক সিকন্দর লোদি সম্বন্ধে আরও বলেন যে, "The accounts of his conquests resemble those of the protagonists of Islam in India. Sikandar Lodi's mind was warped by habitual association with theologians."

পাঠান বীরপুরুষেরা প্রথম যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তাঁরা যে-ভাবে হিন্দুর মন্দির, মঠ, দেবদেবীর উপর যুদ্ধঘোষণা করেন, তার পাঁচ শ' বৎসর পরে পাঠান রাজ্যের যখন ভগ্নদশা, তখন আবার পাঠান পাতশারা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে নব জেহাদ প্রচার করেন কেন? যেকালে সিকন্দর লোদি বৃন্দাবন অঞ্চলে দেবমন্দিরাদির ধ্বংস করেন, ঠিক সেই একই সময়ে গৌড়ের পাতশাহ হুসেন শাহ্‌ও

ওড্র দেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥
(চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়)

৪

এই সময়েই হিন্দুধর্ম্ম নূতন প্রাণ পায়। তাই উক্ত ধর্ম্মের প্রতি পাতশাদের মনে নববিদ্বেষও জাগ্রত হয়। এই নব হিন্দুধর্ম্ম নবরূপ ধারণ ক'রে আবির্ভূত হয়। জ্ঞান-কর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান ক'রে এ ধর্ম্ম একমাত্র ভক্তি-প্রধান হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানন্দ যে ভক্তির ধর্ম্ম উত্তরাপথে প্রচার করেন, সে ধর্ম্ম বহুলোকের হৃদয়-মন স্পর্শ করে। "শুষ্ক জ্ঞান" ও "বাহ্যকর্ম্মের" ব্যবসায়ীদের অর্থাৎ হিন্দুসমাজের ধর্ম্মযাজক-দের ও বেদান্ত-শাস্ত্রীদের যে এই ভক্তিধর্ম্মের প্রতি অসীম অবজ্ঞা ছিল, তার প্রমাণ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাতায় পাতায় আছে।

অপর পক্ষে মৌলবীদের অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রীদের বিদ্বেষের একটি বিশেষ কারণ ছিল। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে, এই প্রবল ভক্তির স্রোতে অনেক মুসলমানও হয়ত ভেসে যাবে, এবং আমার বিশ্বাস, এই শাস্ত্রীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই সেকালের মুসলমান পাতশারা এই নব হিন্দুধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেন। অন্ততঃ সিকন্দর লোদির মন ত was warped by habitual association with theologians.

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল, সেকালের জনৈক ব্রাহ্মণের নব ধর্ম্মমত প্রচার করার অপরাধে প্রাণদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। *Cambridge History of India* থেকে উক্ত ঘটনাটির বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি

"Sikandar had an opportunity while at Sambul of displaying the bigotry which was a prominent feature of his character. A Brahmin of Bengal excited some interest

and among precisians, much indignation, by publicly maintaining that the Mahomedan and Hindu religions were both true, and were but different paths by which God might be approached. A'zam-i-Humayun, governor of Bihar, was directed to send the daring preacher and two rival doctors of Islamic law to court, and theologians were summoned from various parts of the kingdom to consider whether it was permissible to preach peace. They decided that since the Brahman had admitted the truth of Islam, he should be invited to embrace it with the alternative of death in the event of refusal. The decision commended itself to Sikandar and the penalty was exacted from the Brahman, who refused to change his faith."

এ বাঙালী যে কে জানিনে। কিন্তু তাঁর সমকালবর্ত্তী কবীরের মতও ঐ, চৈতন্যেরও তাই। চৈতন্যের শিষ্য যবন হরিদাসের যখন গৌড়ের বাদশার দরবারে বিচার হয়, তখন হরিদাসও ঐ একই মত প্রকাশ করেন, এবং বাংলার ও আগ্রার মৌলবীদের মতে যে—it was not permissible to preach peace, তার কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে উক্ত ধর্ম্মের প্রশ্রয় দিলে কোনও কোনও পাঠানও এই নব বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হবে,—যেমন বিজুলী খাঁ পরে হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস আদিতে এই বৈষ্ণবধর্ম্ম একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ছিল না। পূর্ব্বোক্ত বাঙালী

ব্রাহ্মণ যেমন স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করেও মুসলমান ধর্ম্মের অনুকূল হয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস কোন কোন পাঠানও তেমনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করেও পরম ভাগবৎ হয়েছিলেন, এবং বিজুলী খাঁ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

৫

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক। যে অবস্থায় ও যে কারণে মহাপ্রভুর দলবল পথ-চলতি তুরুখসোয়ারদের হাতে গ্রেপ্তার হন, তার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ঐ সূত্রে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলেছেন যে,—

"সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক, পরম গম্ভীর।
কালোবস্ত্র পরে সেই, লোকে কহে পীর॥"

এই পীরের সঙ্গে মহাপ্রভু শাস্ত্রবিচার ক'রে তাঁকে স্বমতাবলম্বী করেন। পরে পাঠান রাজকুমার বিজুলী খানও স্বীয় গুরুর পদানুসরণ করেন। এই শাস্ত্রবিচারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব, কারণ এ বিচার অদ্ভুত। সেই পীরের "চিত্ত আর্দ্র হইল প্রভুরে দেখিয়া" এবং সে

নির্বিশেষ ব্রহ্মস্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া।
অদ্বয় ব্রহ্ম সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্র যুক্তে প্রভু করিল খণ্ডন॥

মুসলমান পীর যে শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী, এ কথা কি বিশ্বাস্য? তারপর মহাপ্রভুর উত্তর আরও আশ্চর্য্য। তিনি বললেন,—

"তোমার পণ্ডিত সবের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধি মধ্যে, পর বলবান॥

নিজশাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে তাতে শেষ বিচারিয়া।

* * * *

প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে কহে নির্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিহঁ শ্যাম কলেবর॥
সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণব্রহ্মরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদ্য স্বরূপ॥

মহাপ্রভুর মুখে এ কথা শুনে পীর উত্তর করলেন যে,

"অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান॥

এই কথোপকথন আমাদের বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকে, কারণ মুসলমান ধর্ম্মের God যে personal God, বহু দেবতাও নয়, এক নির্গুণ পরব্রহ্মও নয়, এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং কোন পরম-গম্ভীর মুসলমান পীরকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে মহাপ্রভুর পক্ষে আবশ্যক হয়েছিল, এ কথাটা প্রথমে নিতান্তই আজগুবি মনে হয়। কিন্তু যাঁদের মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে কালক্রমে মুসলমান ধর্ম্মও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে, এবং তাদের মধ্যে কোনও কোনও সম্প্রদায় জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে, এবং

কোন ধর্ম্মেরই জ্ঞানমার্গীরা সগুণ ঈশ্বর অঙ্গীকার করে না। উক্ত পীর যে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তা তাঁর পরিধানের কালো বস্ত্র থেকেই বোঝা যায়। সুফীদের সাম্প্রদায়িক বেশ স্বতন্ত্র। সুতরাং পীর মহাশয় সুফী নন, তবে তিনি কি? যাঁরা মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তাঁরা বলতে পারেন।

তারপর আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে মহাপ্রভুর মুসলমান-শাস্ত্রের বিচার। শ্রীচৈতন্য যে মহাপণ্ডিত ছিলেন তা আমরা সকলেই জানি, তবে তিনি যে আরবী শাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন, এ কথা কারও মুখে শুনিনি। তবে এ বিচারের কথাটা কি আগাগোড়া মিথ্যা? আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস, সে-যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিত-মহলে শাস্ত্রবিচার চলত, এবং হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্রীরা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের আসল কথা সব জানতেন। সিকন্দর লোদি গোঁড়া মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর দরবারে জনৈক বাঙালী ব্রাহ্মণের সহিত মৌলবীদের শাস্ত্রবিচারের বৈঠক বসান। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয় ত মহাপ্রভু যে মুসলমান-শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হন, এ কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।

(৬)

কবিরাজ গোস্বামীর এসব কথা যদি সত্য হয়, এবং আমার বিশ্বাস তা মূলতঃ সত্য, তাহ'লে এই প্রমাণ হয় যে, মহাপ্রভু যেমন পুরীতে সার্ব্বভৌমকে, কাশীতে প্রকাশানন্দকে, জ্ঞানমার্গ ত্যাগ ক'রে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিলেন, তেমনি তিনি সৌরক্ষেত্রে জনৈক

পরমগম্ভীর অদ্বৈতবাদী মুসলমান পীরকেও ভগবদ্ভক্ত ক'রে তুলেছিলেন, এবং একমাত্র কোরাণের দোহাই দিয়ে। এবং তিনি পূর্ব্বেও যেমন হিন্দুশাস্ত্রীদের নিকট মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন নি, এক্ষেত্রেও তেমনি তিনি মুসলমান-শাস্ত্রীর নিকট হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন নি। কিন্তু উভয় ধর্ম্মমতেরই যা greatest common measure, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি, তারই মর্ম্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং আমার বিশ্বাস ইতিপূর্ব্বে সিকন্দর লোদি যে-ব্রাহ্মণ বেচারাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, সে বেচারীর অপরাধ—সে একই মত প্রচার করে, কিন্তু তাই ব'লে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে পর-ধর্ম্ম অঙ্গীকার করতে রাজী হয় না—প্রাণ বাঁচাবার খাতিরেও নয়।

ও-যুগটা ছিল এদেশের ধর্ম্মের internationalismএর যুগ। আজও এমন বহু লোক আছেন যাঁরা internationalism কথাটায় ভয় পান, কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও-মনোভাব nationalism-এর পরিপন্থী। সেকালেও অনেকে ধর্ম্ম বলতে বুঝতেন, হয় হিন্দুধর্ম্ম, নয় মুসলমান ধর্ম্ম। কিন্তু মানুষে যাকে ধর্ম্ম-মনোভাব বলে, তার প্রাণ যে ভগবদ্ভক্তি, এ জ্ঞান যার আছে, তার অন্তরে ভেদজ্ঞানটাই অবিদ্যা। আমার বিশ্বাস, সে যুগে ভগবদ্ভক্ত ও বৈষ্ণব—এ দুটি পর্য্যায়-শব্দ ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণের মত পাঠানও স্বধর্ম্ম রক্ষা ক'রেও পরমবৈষ্ণব অর্থাৎ পরম ভাগবৎ হ'তে পারত। সকল ধর্ম্মেরই কথা এক, শুধু ভাষা বিভিন্ন। বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এ কথা বলাও যা আর "স্বধর্ম্ম রক্ষা ক'রে মামেকং শরণং ব্রজ," এ কথা বলাও কি তাই নয়?

(৭)

হিন্দু যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এ ঘটনা আজও ঘটে, কিন্তু মুসলমান যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে, আজ তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণেই 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র কথা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, হিন্দুধর্ম্ম অর্থাৎ হিন্দুসমাজের দরজা আজ বন্ধ হ'লেও, অতীতে খোলা ছিল। আজ আমরা এ সমাজ থেকে অনেক হিন্দুকে বহিষ্কৃত করতে পারি, কিন্তু কোন অহিন্দুকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনে, কারণ আজকের দিনে হিন্দু-সমাজের অর্থ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের অর্থ হিন্দু-সমাজ। আর হিন্দু-সমাজ হচ্ছে অপর সকল মানবসমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে। কিন্তু ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন যে, হিন্দুযুগে অসংখ্য শক ও যবন বৌদ্ধধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটি শাখা মাত্র। আর এ ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার বিশ্বমানবের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগের এই নব বৈষ্ণবধর্ম্মও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের একটি নব শাখা মাত্র। তবে এ নবত্বের কারণ, মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব। মুসলমান ধর্ম্ম যে প্রধানতঃ ঐকান্তিক ভক্তির ধর্ম্ম, এ কথা কে না জানে? ভারতবর্ষের মধ্যযুগের বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে মুসলমান ধর্ম্মের এতটা গা-ঘেঁসা, তার কারণ পাঁচ-শ বৎসর ধ'রে হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম পাশাপাশি বাস ক'রে আসছিল। একেশ্বরবাদ ও মানুষমাত্রেই যে ভগবানের সন্তান, এ দুটিই হচ্ছে মুসলমান ধর্ম্মের বড় কথা। তাই এই নব হিন্দুধর্ম্মে অহিন্দুরও প্রবেশের পূর্ণ অধিকার ছিল। তা যে ছিল, তার প্রমাণ 'চৈতন্য ভাগবৎ'

ও 'চৈতন্যচরিতামৃতের' মধ্যে দেদার আছে। সুতরাং শীলমহাশয়ের আবিষ্কৃত মহম্মদ খাঁ নামক পাঠানও যে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, এ কথা অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ নেই। তবে বিজুলী খাঁ নামক যে একটি স্বতন্ত্র পাঠান রাজকুমার ছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই, এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের মথুরার সন্নিকটে দেখা হয়েছিল *Tabakat-i-Akbari* নামক ফার্সী গ্রন্থে তাঁর নামধাম এবং তাঁর বাপের নামও পাওয়া যায়। আকবর কর্ত্তৃক কালিঞ্জর-দুর্গ আক্রমণসূত্রে গ্রন্থকার বলেন যে,

"This is a strong fortress, and many former Sultans had been ambitious of taking it. Sher Khan Afghan (Sher Shah) besieged it for a year, but was killed in the attempt to take it, as has been narrated in the history of his reign. During the interregnum of the Afghans, Raja Ram Chunder had purchased the fort at a high price from Bijilli Khan, the adopted son (Pisan-i-khwanda) of Bihar Khan Afghan." (Elliot's *History of India*, vol. v., p. 333).

এর থেকে জানা যায় যে, রাজকুমার বিজুলী খাঁ কালিঞ্জরের নবাবের পোষ্যপুত্র; এবং তিনিই এ রাজ্য রাজা রামচন্দ্রকে বিক্রী ক'রে চলে গিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে। তবে তিনি যে কবে কালিঞ্জর-রাজ্য ত্যাগ করেন, তার তারিখ আমরা জানি নে, সম্ভবতঃ তাঁর পিতা বিহারী খাঁ আফগানের মৃত্যুর পর তিনি যখন স্বয়ং নবাব হন। শের শাহ্‌র মৃত্যু

হয়েছিল ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে, বিজুলী খাঁ খুব সম্ভবতঃ এর পরেই কালিঞ্জর হস্তান্তর করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁর "অল্প বয়েস", সুতরাং রাজা রামচন্দ্রকে তিনি যখন কালিঞ্জর-দুর্গ বিক্রী করেন, তখন তাঁর বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। বিজলী খাঁ কালিঞ্জরের নবাব হওয়া সত্ত্বেও যে পরম-ভাগবত ব'লে গণ্য হয়েছিলেন, এ ব্যাপার অসম্ভব নয়। বৌদ্ধযুগের বড় বড় রাজা-মহারাজারাও পরম সৌগত ব'লে গণ্য হতেন। তা ছাড়া, এ নব বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হবার জন্য, বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করবার প্রয়োজন ছিল না। 'ভোগে অনাসক্ত' হ'লেই বৈষ্ণব হওয়া যেত। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে এই কথা ব'লেই তাঁকে সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প হ'তে বিরত করেন।

মহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অপরকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে কখনও উৎসাহ দেন নি। এমন কি, বালযোগী অবধূত নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিলেন।

এই সব কারণে, আমার বিশ্বাস যে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত উক্ত ঘটনাটি অন্ততঃ চৌদ্দ আনা সত্য, অতএব ঐতিহাসিক। কারণ আমরা যাকে ঐতিহাসিক সত্য বলি, তার ভিতর থেকে অনেকখানি খাদ বাদ না দিলে তা বৈজ্ঞানিক সত্য হয় না। ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে অসত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মাঝামাঝি একরকম সত্যাসত্য মাত্র। আর এক কথা। আমরা যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনেক কথাই কবিকল্পিত মনে করি, তার কারণ সেকালের অনেক পুঁথিই আমরা কাব্য হিসেবে পড়ি, যদিচ কাব্যের কোন লক্ষণই তাদের গায়ে নেই, এক পয়ারের বন্ধন

বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌ম্ *

শ্রীযুক্ত "বিচিত্রা"-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

এ মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর "বাঙলা ও ভারতবর্ষ" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়লুম। প্রবন্ধের আসল বক্তব্য যে কি ...তা খুব স্পষ্ট নয়। অনেক কথার মধ্যে আসল কথাটি অনেক সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। বোধ হয় লেখক মহাশয় বল্‌তে চান যে, ভারতবর্ষের পলিটিকাল ঐক্যের পথে প্রধান বাধা হচ্ছে বাঙলা। এ বাধার মূলে অবশ্য বাঙালী জাতের সাংসারিক স্বার্থ নেই, আছে তার মন। এতেই ঘটেছে বিপদ। কেন না স্বার্থান্ধ লোক না কি পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে ততটা অচল নয় যতটা আত্মাভিমানী লোক। বাঙালীরা যে বাঙালী, অ-বাঙালী নয়, এ জ্ঞানটি তাদের পুরো মাত্রায় আছে। আর আমাদের এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানই না কি পাঁচজনের কাছে নাই পেয়ে পেয়ে এখন নির্লজ্জ অহংজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। বাঙালীর মত আত্মাভিমানী জাত, ভারতবর্ষে না কি আর দ্বিতীয় নেই। Know thyself, সক্রেটিসের এই পুরোণো কথার ধার ভারতবর্ষে না কি অ-বাঙালীরা ধারে না। বাঢ়ং। আর বাঙালীর হাম-বড়ামির প্রশ্রয় দিয়েছেন, সেই দলের বাঙালীরা, যাঁরা

* ১৩৩৭ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নীরোদচন্দ্র চৌধুরী লিখিত "বাঙলা ও ভারতবর্ষ" প্রবন্ধের উত্তরে লিখিত।

প্রধানতঃ বাংলা ভাষায় লেখেন ও বক্তৃতা করেন। যথা রবীন্দ্রনাথ, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি লোকমান্য লেখক ও বক্তারা। আমিও নাকি উক্ত দলের একজন। আমাদের এই ক্ষুদ্র মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ তিনি পাঠক-সমাজের উচ্চ আদালতে অনেক documentary evidence পেশ করেছেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তিনি সুরুতেই একটি গল্প বলেছেন। এ গুজবটি তাঁর পরের মুখে শোনা। আর hearsay যে no evidence, এ কথা আশা করি নীরদবাবু জানেন। সুতরাং ও গল্পটি না বল্‌লেও তাঁর অভিযোগ তিলমাত্রও কমজোর হত না।

আমার বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ পূর্ব্বেও আনা হয় এবং আমি তখন প্রকাশ্যে guilty plead করি। আমার কবুল জবাবটি দশ বৎসর আগে 'সবুজ-পত্রে' ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। আপনি যদি উক্ত পত্রাকারে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করেন ত খুসী হই, কারণ নীরদবাবুর অভিযোগটি কতদূর ও কোন হিসাবে সত্য, তা পাঠকসমাজ, আমার নিজের স্বীকারোক্তি থেকেই জান্‌তে পারবেন।

উক্ত পত্র আজ লিখ্‌তে বসলে, তার আকার-ইকার অল্পবিস্তর বদ্‌লে যেত ; তাহলেও সেই নব-প্রবন্ধের ভিতর থেকে একই পুরোণো মনোভাব বেরিয়ে পড়্‌ত। মেকলে বহুকাল পূর্ব্বে বলে গিয়েছেন যে, বাঙালী তার প্রকৃতরূপ কিছুতেই বদ্‌লাতে পারে না, আর আমি যে বাঙালী, তা ত নীরদবাবুই বলে দিয়েছেন।

এই পুরোণো লেখাটি আর এক কারণে পুনঃ প্রকাশিত করতে চাই। নীরদবাবু বলেন, যে, এই যুগের যুবকরা ও-সঙ্কীর্ণ মনোভাব থেকে মুক্তি

লাভ করেছে। ইতিমধ্যে বাঙালী মনের এ রূপান্তর যদি ঘটে থাকে, তাহলে একালের তরুণরাও দেখতে পাবেন যে, তাঁরা গত দশ বৎসরের মধ্যে নব-ভারত-সভ্যতার পথে কতদূর এগিয়ে এসেছেন, আমাদের পাঁচজনের কথা ঠেলে। নীরদবাবু যে ফরাসী লেখকের দোহাই দিয়েছেন, তাঁর কথার এস্থলে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ অধিকাংশ পাঠক ফরাসী ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে জুলিয়াঁ বাঁদার La trahison des clercs নামক গ্রন্থের ধর্ম্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত।

আমি শুধু একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমি যদি ফরাসী লিখতে পারতুম, অথবা তিনি যদি বাঙলা পড়তে পারতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বল্‌তেন "ভাই হাত মিলানা।"

(২)

[চৌধুরী মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নিম্নের অংশটি সবুজ-পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল। বিঃ সঃ।]

অমৃতশহর কংগ্রেসের পিঠ পিঠ তুমি আমাকে যে চিঠি লেখ, তার উত্তর আমি দিই নি, কেননা উত্তর যে কি দেব তা তখন ভেবে পাই নি। তুমি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনো যে, আমার অন্তরে যা আছে সে হচ্ছে বাঙালী-পেট্রিয়টিজম। এ অভিযোগে আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য। বাঙালী পেট্রিয়টিজমকে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালীর পক্ষে যদি দোষের হয়, তাহলে সে দোষে আমি চিরদিনই দোষী আছি। আমার গত আট বৎসরের লেখার ভিতর এ অপরাধের এত প্রমাণ আছে যে, সে সকল একত্র সংগ্রহ করলে একখানি নাতিহ্রস্ব পুস্তিকা হয়ে ওঠে।

তবে জিজ্ঞাসা করি, একজন বাঙলা-লেখকের কাছ থেকে তুমি আর কোন্ পেট্রিয়টিজমের প্রত্যাশা কর ? আমি যে ইংরাজী লিখি নে তার থেকেই বোঝা উচিত যে অ-বঙ্গ পেট্রিয়টিজম আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। যে ভাষা ভারতবর্ষের কোন দেশেরই ভাষা নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা গণ্য ক'রে সেই ভাষাতে পেট্রিয়টিক বক্তৃতা করতে হলে, আমি সেই পেট্রিয়টিজমের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ষের কোন দেশের প্রতি ভালবাসা নয়, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি। মুখস্থ ভাষায় শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করা যায়। তার প্রমাণ আমাদের কনফারেন্স-কংগ্রেসে নিত্যই পাওয়া যায়, দেশের যত মুখস্থবাগীশ—ও-সকল সভার তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক। সে যাই হোক্, কোনরূপ ভালবাসার কৈফিয়ৎ চাওয়ায় যেমন অন্যায়, দেওয়াও তেমনি শক্ত, তা সে অনুরাগের পাত্র ব্যক্তিবিশেষই হোক, জাতিবিশেষই হোক। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল যে, আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতি-প্রীতি। দেশকে ভালবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালবাসা —কেননা মানুষে শুধু মানুষকেই ভালবাসে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি মানুষকে নয় মাটিকে ভালবাসেন, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষ নন—জড়পদার্থ, কেন না জড়ের প্রতি জড়ের যে একটা নৈসর্গিক ও অন্ধ আকর্ষণ আছে, এ সত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কার করেছে।

যাক্ ও সব অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, স্বজাতি-প্রীতির কৈফিয়ৎ কারো কাছে চাওয়া অন্যায়, কারণ ও হচ্ছে মনের একটা দুর্ব্বলতা। স্বজন-বাৎসল্যরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য যখন অর্জ্জুনেরও ছিল, তখন আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আর বাঙালী বাঙালী-মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ—ভাষার যোগ হচ্ছে, মানস কায়ে রক্তের যোগ। সুতরাং বাঙালীদের পরস্পরের প্রতি নাড়ীর টান থাকাই স্বাভাবিক, না থাকাটাই অদ্ভুত।

তার পর এ প্রীতির পূরো কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত, কেননা তার মূল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। ছেলেবেলায় গুরুমহাশয়েরা আমাদের একটা ভারি শক্ত অঙ্ক কষতে দিতেন, যা আমরা সকলে কষে উঠতে পারতুম না। সে অঙ্ক হচ্ছে এই :—

আছিল দেউল এক পর্ব্বত-প্রমাণ
তেহাই সলিলে তার............

তার পর কি আছে ঠিক মনে পড়ছে না। কবিতা আমার কণ্ঠস্থ থাকে না। তবে এটুকু মনে আছে যে, সে মন্দিরের মাটির ভিতর কতটা পোঁতা আছে আঁক কসে তাই আমাদের বার করতে হত। এখন আমার কথা এই যে, মানুষের মন পর্ব্বত-প্রমাণই হোক আর বল্মিক-প্রমাণই হোক, তার সমস্তটা জেগে নেই। তার অনেকটা স্বজাতির মনের জমির নীচে পোঁতা আছে; যেটুকু জেগে আছে সেইটুকু আমরা দেখতে পাই, অপরকেও দেখাতে পারি; কিন্তু সেই আংশিক মন দিয়ে আমাদের সমগ্র মনের পূরো পরিচয় আমরা দিতে পারি নে। সুতরাং আমাদের রাগদ্বেষের সঠিক কারণ আমরা সব সময়ে নিজেও জানি নে, অতএব পরকেও জানাতে পারিনে। এ ক্ষেত্রে নিজের কোট বজায় রাখবার জন্য মানুষে যে সব তর্কযুক্তি দেখায় সে সব ষোলআনা গ্রাহ্য নয়। কেননা যুক্তিতর্কের দোষ এই যে, তার দ্বারা আমরা অপরকে প্রবঞ্চিত করতে না চাইলেও অনেক সময় নিজেকে প্রবঞ্চিত করি। কে না জানে যে,

পৃথিবীতে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বড় বড় কথার সৃষ্টি হয়েছে সে সকল অধিকাংশ লোকের শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার কাজেই লাগে। আমি একজন মহাধার্ম্মিক, উপরন্তু মহা পেট্রিয়ট, এ কথা মনে ক'রে কে না আত্মপ্রসাদ লাভ করে ?

এতক্ষণে বুঝতে পারছ যে, আমি আমার বাঙ্গালী পেট্রিয়টিজম সমর্থন করে, তোমার কাছে কোনো লিখিত জবাব কেন দাখিল করি নি। তা করলে নিজের না হোক, নিজের জাতের জাঁক আমাকে নিশ্চয়ই করতে হত।

কিন্তু সেদিন তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে ক'রে আমার এই মৌনতার জন্য অনুতাপ করছি। 'সবুজপত্রে' তোমার অনুরোধ মত আমার কৈফিয়ৎ-সহ তোমার পত্র প্রকাশ না করার দরুণ, সে পত্র তুমি হিন্দিতে অনুবাদ ক'রে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রকাশ করেছ। যদি জান্‌তুম, "রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" সেই ভাবে আমার কৈফিয়ৎ তোমার পত্রের অনুচর হ'য়ে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রবেশ লাভ করবে, তাহলে আমার মরচে-পড়া ওকালতী বুদ্ধি মেজে ঘসে তার সাহায্যে এমন একটি বর্ণনাপত্র তৈরী করে দিতুম, যাতে সত্য মিথ্যা একাকার হয়ে যেত, আর যা পড়ে পলিটিক্যাল-হাকিমের দল আমার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী দিতে পারতেন না।

৩

সংস্কৃতে বলে 'গতস্য শোচনা নাস্তি', কিন্তু ইংরাজীতে বলে "it is never too late to mend'; আমি ইংরাজী-শিক্ষিত, অতএব ঐ ইংরাজী

বচন শিরোধার্য্য করে, এ কৈফিয়ৎ লিখতে বসেছি এই আশায় যে সেটি হিন্দিতে, অর্থাৎ—আগামী স্বরাজের lingua-franca-য় প্রমোশন পাবে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে বাঙালীর ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালী নই। একছত্র, একদণ্ড ইংরাজ শাসনের অধীনে বাস ক'রে, আর পাঁচ থেকে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত ইংরাজ-শাসিত স্কুল-কলেজে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে, আমি হয়ে উঠেছি একজন neo-Indian ওরফে non-Indian, অর্থাৎ—কংগ্রেসওয়ালারা যে জাত আমিও সেই জাত। পলিটিক্সের সুরা আমিও যথেষ্ট পান করেছি এবং তার নেশা আজও ছাড়াতে পারি নি, আর ভারতবর্ষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অদ্যাবধি আমি সেই নেশার ঝোঁকে না হোক সেই নেশার চোখেই দেখি। সুতরাং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের সপক্ষে ভারতবর্ষীয় পলিটিক্সের দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে ত তাই বলব। বাঙালী পেট্রিয়টিজমের মূলে আছে বাঙালী জাতির স্বীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান। Self-determination of small nations-এর মতানুসারে বাঙালী-পেট্রিয়টিজমের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ আমরা একটি বিশেষ জাতি, তারপর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি, সুতরাং আমাদের self-determinationর বিরোধী হচ্ছে Indian Imperialism. আর গতযুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, Imperialism সর্ব্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। ইংরাজের সাম্রাজ্যের ভিতর বিদেশ আছে, জর্ম্মাণীর ছিল শুধু স্বদেশ। আর জর্ম্মাণীর এই স্বদেশী imperialism, জার্ম্মাণ জাতির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপাতের যে একমাত্র কারণ, তার খোলা-দলিল ত আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখেই পড়ে রয়েছে। বহুকে এক করবার চেষ্টা

ভাল, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেন না তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বলো যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে self-determination যদি না খাটে ত ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোন জাতির সঙ্গে অপর কোন জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাঙলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সে প্রভেদ নেই, এমন কি ফ্রান্সের সঙ্গে জর্ম্মাণীরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের নাম শুনলে এক দলের পলিটিসিয়ানরা আঁত্‌কে ওঠেন তার কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ও মনোভাব জাতীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে, কোনও মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর, যেহেতু তিনি পাড়া-পড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন তাহলে সে অভি-যোগের কি কোনও প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বা-ভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর শোনে অমানুষে। ধরো যদি কোনও জননী নিজেকে জগজ্জননী জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলে-মেয়েদের নিজের স্তনের দুধ যোগাতে ব্রতী হন, তাহলে কাউকে বঞ্চিত না করে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিতে হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান ক'রে কারও পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পলিটিসিয়ানরা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজমের উক্তরূপ জলো-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

৪

যদি জিজ্ঞাসা করো যে, এই সহজ সত্যটা লোকের চোখে পড়ে না কেন?—তার উত্তর আমাদের অবস্থার গুণে। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বিদেশী রাজার অধীনে, সুতরাং ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশেরই আজ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আজ প্রধান বন্ধন হচ্ছে পরাধীনতার বন্ধন, এবং এ অধীনতার পাশ হতে কোনও প্রদেশবিশেষ নিজ চেষ্টায় নিজ কর্ম্মগুণে মুক্ত হতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের সবারই পলিটিক্যাল-সমস্যা একই সমস্যা। সে সমস্যা হচ্ছে এই যে, অধীনতা কি করে স্বাধীনতায় পরিণত করা যায়। সুতরাং আজকের দিনে ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে 'সংগচ্ছদ্ধং সংবদদ্ধং' এই উপদেশ কিম্বা আদেশ দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের সকলেরই তাই একই বাদ, সে অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর আমাদের সকলেরই গম্যস্থান একই—স্বরাজ্যে।

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের মূল্য যে কি, তা দেশের লোক স্বরাজ্যে পৌঁছিবামাত্র টের পাবে। অধীনতার যোগসূত্র স্বাধীনতার স্পর্শে ছিঁড়ে যাবে। প্রভুত্বের চাপে দাসের দল একাকার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানব তার স্বধর্ম্মের চর্চ্চা ক'রে তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলবে। তখন ভারত-বর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবে। আজকের দিনের কংগ্রেসী-ঐক্যের সঙ্গে সে ঐক্যের আকাশ-পাতাল প্রভেদ হবে। বাইরের চাপে মিলিত হওয়া, আর প্রীতির প্রভাবে মিলিত হওয়া একবস্তু নয়। এক জেলে পাঁচজন

কয়েদীর মিলন আর এক সমাজের পাচজন স্বাধীন লোকের মিলনের ভিতর যে প্রভেদ আছে, আজকের ভারতের নানা জাতির কংগ্রেসী-মিলনের সঙ্গে কালকের স্বরাজ্যবাসী জাতিদের মিলনের সেই প্রভেদ থাকবে। তখন প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের ভিত্তির উপরেই বাক্যগত নয়, বস্তুগত ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজম গড়ে উঠবে।

আমি শুধু এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কংগ্রেসী-পেট্রিয়-টিজমের পিছনে যে মন আছে, সে হচ্ছে আমাদের সকল জাতের বিলেতি পুঁথিপড়া মন। সে মন আমাদের সবারই এক। কিন্তু তার নীচে যে মন আছে সে মন প্রতি জাতির নিজস্ব এবং পরস্পর পৃথক। আর আমাদের ভবিষ্যত সভ্যতা গড়ে উঠবে আমাদের মনের এই গভীর অন্তস্তল হতে। বিদেশী-শিক্ষার ফলে এই সত্যটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে বলে আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রতি জাতিকে বলা আবশ্যক Know thyself এবং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের সার্থকতাই এইখানে। স্বজাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্য আমাদের সকলেরই আজ প্রস্তুত হতে হবে।

৫

আর বেশি এগোবার আগে একটা কথার অর্থ পরিষ্কার করা দরকার, সে কথাটা হচ্ছে স্বার্থ। ও-কথাটা উচ্চারণ করবামাত্র আমাদের চোখের সুমুখে ধন-ধান্যের সোনার ছবি এসে দাঁড়ায়। এ ত হবারই কথা। আমরা যখন প্রাণী ও প্রাণের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা যখন আত্মরক্ষা করা, তখন অন্ন আমাদের চাই-ই চাই।

আর পলিটিক্সের যত বড় বড় কথা আছে তার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক খোলস ছাড়িয়ে নিলে কি দেখা যায় না যে, তার ভিতরকার মোটা কথা হচ্ছে অন্ন? আজকের দিনে পৃথিবীতে পলিটিক্সের দুটি বড় কথা হচ্ছে capitalism এবং bolshevism, বাদবাকী আর যত রকম 'ism' আছে সে সবই হয় capitalism নয় bolshevism-এর কোঠায় পড়ে। হাল পলিটিক্সের এই দুই ধর্ম্ম এতই পরস্পর-বিরোধী যে উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধেক পৃথিবী জুড়ে আজ জীবন-মরণের যুদ্ধ চলেছে। অথচ এই উভয় পলিটিক্যাল ধর্ম্মের ভিতর একই জিনিস আছে এবং সে জিনিস হচ্ছে অন্ন। তবে মানব জাতি যে দুভাগ হয়ে পড়েছে সে ঐ অন্নের ভাগ নিয়ে। Capitalism-এর মূল সূত্র হচ্ছে অল্প লোকের বহুঅন্ন আর bolshevism-এর মূল সূত্র হচ্ছে বহুলোকের যথেষ্ট অন্ন। আমার বিশ্বাস এ দুয়ের কোনটিই টিঁকবে না। কেননা capitalism ভুলে গিয়েছে যে রুটি সকলেরই চাই, আর bolshevism মনে রাখে নি man does not live by bread alone, অর্থাৎ—মানুষের মন বলেও একটা জিনিস আছে, অতএব পেটের খোরাক ছাড়া মানুষের মনের খোরাকও চাই, নচেৎ মানুষ পশুর সঙ্গে নির্বিশেষ হয়ে পড়ে।

এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, স্বার্থের মোটা অর্থ হচ্ছে পেটের স্বার্থ, আর পলিটিক্স ও ইকনমিক্স প্রভৃতি মুখ্যতঃ এই স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রতন্ত্র। মনের স্বার্থের সঙ্গে এ মন্ত্রতন্ত্রের সম্বন্ধ গৌণ। তবে যে পেটের কথাকে আমরা আত্মার কথা বলে ভুল করি, তার কারণ অন্নের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের, সংক্ষেপে উদরের সঙ্গে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের সুখ, মানুষের

উন্নতি এই অন্ন ও মনের যোগাযোগেরই উপর নির্ভর করে। একমাত্র ভৌতিক ভাত খেয়ে মানুষ তার সৎ রক্ষা করতে পারলেও, তার চিৎ ও আনন্দ রক্ষা করতে পারে না। অপর পক্ষে একমাত্র ত্বরীতানন্দ সেবন করে মানুষ তার আনন্দ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও সৎ রক্ষা করতে পারে না। আর সচ্চিদানন্দ হওয়াই ত মানবজীবনের সার্থকতা। অতএব দাঁড়াল এই যে, মানুষের পক্ষে যেমন লাঙ্গল চাই তেমনি লেখনীও চাই, যেমন হাতুড়ি চাই তেমনি তুলিও চাই. জাতীয় জীবনে যেমন পলিটিক্স ও ইকনমিক্স চাই, তেমনি বিজ্ঞান ও আর্ট, কাব্য ও দর্শনও চাই।

সুতরাং একজাতের nationalism-এর নাম শোনবামাত্র আমরা যখন সেটি অপরের nationalism-এর বিরোধী মনে করে ভীত হয়ে উঠি, তখন বুঝতে হবে যে আমরা nationalism শব্দটা তার শুধু ঔদরিক অর্থে বুঝি, কেননা মানুষ মানুষের সঙ্গে শুধু অন্ন নিয়েই মারামারি কাড়া-কাড়ি করে, কিন্তু মানুষের মনোজগতের বস্তু হচ্ছে পরস্পরের আদান-প্রদানের বস্তু, এক কথায় বিশ্বমানবের সম্পত্তি কোনও জাতিবিশেষের স্থাবর সম্পত্তি নয়। যদি কোনও ব্যক্তি অপর জাতের সঙ্গে মনের কারবার বন্ধ করবার প্রস্তাব করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি হচ্ছেন ঘোর materialist, কেননা তাঁর বিশ্বাস যে mind-ও matter-এর মত দেশের গণ্ডীতে বদ্ধ। এ কথাটা এখানে উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে, এ দেশে নিত্যই দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার বেনামিতে জড়বাদ যেমন শতমুখে প্রচার হচ্ছে, তেমনি দেশময় নির্ব্বিচারে গ্রাহ্যও হচ্ছে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ঔদরিকস্বার্থসাধন করবার চেষ্টাটা মোটেই নিন্দনীয় নয়, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও নয়, জাতিবিশেষের

পক্ষেও নয়। সুতরাং পলিটিক্সের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে জাতীয় অন্ন-সমস্যার সমাধান করা। আর বলা বাহুল্য, এ সমস্যার মীমাংসা জাতীয় অবস্থার জ্ঞান সপেক্ষ। কথার রাজ্য থেকে কাজের রাজ্যে নেমে এলেই আমাদের বস্তুজগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অনেকটা আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। দেশশাসনের ভার যখন আমাদের হাতে আসবে তখন দেখা যাবে যে, প্রতি প্রদেশ তার নিজের সামাজিক ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন যা আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে সে হচ্ছে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজম। যে রুসোর পলিটিকাল মতামতের ঘসা-পয়সা নিয়ে আমাদের পেট্রিয়টিজমের আগাগোড়া কারবার, তিনিই বলে গেছেন যে, কর্ম্মক্ষেত্রে পেট্রিয়টিজমকে অনেকটা সঙ্কুচিত করে আনতে হয়।

সে যাই হোক, আমার বাঙালী nationalism মুখ্যতঃ মানসিক এবং গৌণতঃ রাজনৈতিক। আমাদের মনের স্বরাজ্য লাভ করা ও রক্ষা করা এবং তার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমার প্রধান ভাবনা। রাজনৈতিক স্বরাজ মনে স্বরাট হবার একটি উপায় মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৬)

এখন বাঙালীর মনের বিশেষত্ব যে কোথায় তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক্। এ পরিচয় দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা বাঙ্গালীর national-self-consciousness কতকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে। এই national-self-consciousness কথাটা আমাদের স্বদেশীযুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে অবশ্য দেশের লোক কথাটা তার

পলিটিক্যাল অর্থেই বুঝত। তখন আত্মজ্ঞান অর্থে আমরা বুঝতুম আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চৈতন্য ও বেদনা। বলা বাহুল্য, এই সংকীর্ণ অর্থে, সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান ও বাঙলার আত্মজ্ঞান একই বস্তু। কিন্তু এ বোঝাটা ভুল বোঝা। কেন না তা হলে স্বাধীন জাতের পক্ষে—জাতীয় আত্মজ্ঞান বলে কোনও জিনিসই নেই। কিন্তু তা যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে,ঐ সমস্ত পদটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করা হয়েছে, ও-পদের বিলেতে জন্ম। কথাটা এতই বিলেতি যে, আমাদের কোনও ভাষায় ওটির সঠিক তরজমা করা চলে না।

মানুষ মাত্রেই মুখ্যতঃ এক হলেও সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে। আর ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলা, কেন না সে চেষ্টাতেই তার সুখ, সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি। যাতে করে এই স্বাতন্ত্র্য চেপে দেয় তাই হচ্ছে বন্ধন। জীবনের বন্ধনের চাইতে মনের বন্ধন কম মারাত্মক নয়। আর আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্য। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে বাঙলা সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনও জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে এক লোকে বাস করি নে।

আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্যবিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোনও জাত তদনুরূপ পারেনি।

ইউরোপীয় শিক্ষা যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের অল্প-বিস্তর বদল করেছে, এ কথা আমি মানি,—কেননা না মেনে উপায় নেই। আমাদের পলিটিক্যাল মতামত যে 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত আগাগোড়া বিলেতি জিনিস, এতো সবাই জানে। দেশশুদ্ধ লোকের পলিটিক্যাল আত্মা যে ইউরোপের হাতে গড়ে উঠেছে, এ কথা এক পেশাদার ন্যাসনালিষ্ট ছাড়া আর কারো অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

তবে অপর ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ইউরোপের কাছে এক পলিটিক্স ছাড়া আরো কিছু বিদ্যা আদায় করেছি। ইউরোপের কাব্যবিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। Lafcadio Hearn-এর বইয়ে পড়েছি যে সেক্সপিয়রের নাটক জাপানীদের মনের কোনখানে স্পর্শ করেনা। অপরপক্ষে সেক্সপিয়রের কাব্য আমাদের মনের সকল তারে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে ওঠে।

শুধু কাব্য নয়, ইউরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে; ইন্দ্রিয়ের দর্শনের স্পর্শনের, মনের ধ্যানধারণার বস্তু। আমরা জানি রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে; রূপ খালি আর্টে নেই, প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য, তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ

লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই বিশ্ব নামক মহাকাব্যের রসাস্বাদ করবার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই মনে আছে। তাই না বাঙ্গালী যুবক Einstein-এর নবাবিষ্কৃত আলোকতত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল, যদিচ তারা সবাই জানে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্ম্মে ভাঙিয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাঙলায় জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালীর এতটা ঝোঁক।

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত বলবেন যে, বাঙালার জ্ঞান, জ্ঞানমাত্রই থেকে যায়, তা কোনও কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগ যে বাঙালী ততটা করায়ত্ত করতে পারেনি, এ কথা সত্য। আমার বিশ্বাস এ অক্ষমতার জন্য যত না দায়ী আমাদের প্রকৃতি, তার চাইতে ঢের বেশি দায়ী আমাদের অবস্থা। কল-কারখানা গড়বার শক্তির অভাব সম্ভবতঃ বাঙালীর নেই, অভাব আছে শুধু সুযোগের। সে যাই হোক, যা সত্য ও যা সুন্দর তার প্রতি বাঙালী মনের এই সহজ আনুকুল্যের প্রশ্রয় দিয়েই তার জাতীয় জীবন সার্থক করে তোলা যেতে পারে। যেমন ব্যক্তি-বিশেষের তেমনি জাতিবিশেষের প্রকৃতির উল্টো টান টানতে গেলে তার জীবনকে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর করা হয়। আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুক উঠেছে তাতে যে বাঙালী সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ যে-বাঙালীর চিন্তা করবার অভ্যাস আছে, সেই জানে যে উচ্চ শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্বোধিত করবার সর্ব্বপ্রধান উপায়। কোনও জাতির পক্ষে স্বধর্ম্ম হারিয়ে স্বরাট হবার

চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। ভারতবাসী যখন স্বরাজ লাভ করবে, তখন ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশই তার শিক্ষা-দীক্ষার উপর অপর কোনও প্রদেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। প্রতি স্ববশ সজ্ঞান জাতির একটা-না-একটা বিশেষ জাতীয় আদর্শ থাকে, এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজত্ব বলে কোনও জিনিস নেই, অথবা নিজত্ব যে রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায়, তার পক্ষে স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নেই; শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোন অর্থও নেই। স্বত্বসাব্যস্ত করবার জন্যই ত স্বাধীনতার আবশ্যক।

আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পুঁথিপড়া মনের সঙ্গেও বাকী ভারতবর্ষের পুঁথিপড়া মনের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং আমাদের পলিটিক্যাল মনও অন্য প্রদেশের পলিটিক্যাল মনের ঠিক অনুরূপ নয়। মনে রেখো, মানুষের পলিটিক্যালমন তার সমগ্র মনের বহির্ভূত নয়, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতও নয়। অবশ্য একদলের কংগ্রেস-ওয়ালা আছেন যাঁরা এ কথা মানেন না; যদি মানতেন, তা'হলে তাঁদের দলে টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ অদ্ভুত জীবের এতটা প্রাধান্য হত না।

ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের মনের যে বদল আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাদের যুবকশ্রেণীর মনে যে প্রবেশ করেছে তার পরিচয় আমি পাচজনের সঙ্গে কথায়বার্ত্তায় নিত্যই পাই। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করব না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশের অধিকাংশ লোককে দাস ও স্ত্রীলোককে দাসী করে রাখব, অথচ পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মত রাজনৈতিক জগতে স্বরাট হব, এরূপ মনোভাব যে যুগপৎ লজ্জাকর ও হাস্যকর, এ ধারণা এ যুগের বহু বাঙালীর মনে জন্মেছে।

তবে এ মনোভাব যে আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রে ও বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে গর্জ্জে ওঠেনি, তার কারণ নিজের বিরুদ্ধে হুজুগ করা চলে না। যে ভাব মনে পোষণ করবার জন্য, যে কাজ করবার জন্য আমরা মনে মনে লজ্জিত হই, তা নিয়ে প্রকাশ্য ঢাক পেটানো অসম্ভব; আমরা ঢাক পেটাতে পারি শুধু আমাদের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। কতকটা শিক্ষার বলে, কতকটা পরীক্ষার ফলে, আমরা আমাদের প্রকৃতি ও শক্তি দুয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেছি। নিজের ত্রুটির জ্ঞানও আত্মজ্ঞানেরই একাংশ; এবং আত্মজ্ঞান আমাদের মনে জন্মেছে বলে, তারই উপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের অন্তরের বল আমরা পরিপুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাই নে; আর আমাদের দুর্ব্বলতা আমরা পরিহার করতে চাই বলে, আমরা লোকের জাতি বিচার করে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয় করে রাখা, পেট্রিয়টিক কাজ বলে মনে করিনে। কোন জাতির পক্ষে তার চিরাগত সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করে নবজীবন ও নবশক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয়; এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবার সাধন-পদ্ধতির নাম রাজনৈতিক হুজুগ নয়, কেননা ক্ষণিক উত্তেজনার পিঠ পিঠ আসে স্থায়ী অবসাদ। জাতীয় ঐশ্বর্য্য অবশ্য জাতীয় কৃতিত্বের উপর গড়ে ওঠে, এবং কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সাহিত্যে ও সমাজে, দর্শনে ও ধনে, বিজ্ঞানে ও আর্টে। মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা উপাধি কিম্বা ওকালতি, শুনতে মহা কঠিন; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা, অর্থাৎ কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী

হওয়াই কঠিন, কেননা এ লড়াই চিরজীবনব্যাপী, এক মুহূর্ত্ত তার বিরাম নেই। দেখতে পাচ্ছ আমি রাজসিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি। একে আমি বৈদিক-তান্ত্রিকসমাজে জন্মগ্রহণ করেছি; তার উপর আবার ইউরোপের রাজসিক সভ্যতার আব্‌হাওয়ায় মানুষ হয়েছি; সুতরাং আমার কাছ থেকে তুমি অন্য কোনও মনোভাবের পরিচয় পাবার আশা করতে পারনা। রাজসিক মন সাত্ত্বিক মনের চাইতে নিকৃষ্ট কি না বলতে পারিনে, তবে তা যে তামসিক মনের চাইতে শ্রেষ্ঠ,সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, দেশে আজকাল যে-সকল মনোভাব সাত্ত্বিক বলে চলছে, সে-সব পূরোমাত্রায় তামসিক। সে-সবের মূলে আছে অজ্ঞতা আর ঔদাসীন্য, এক কথায় মনের জড়তা।

আমি বিশ্বাস করতে ভালবাসি যে, আমার মন এ যুগের বাঙলার মন। যদি তাই হয় ত বাঙালীর nationalism-এর আদর্শ যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়। সমগ্র ভারতবাসীকে ডোরকৌপীন পরানো আমাদের আদর্শ হতে পারে না। আজকের দিনে বাঙালীর যদি কোনও আন্তরিক প্রার্থনা থাকে ত সে এই—

"বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

কিন্তু এ প্রার্থনা, কোনও বাইরের শক্তির কাছে নয়। নিজের অন্তর-নিহিত শক্তির কাছে। কারণ এ সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি যে, বিদ্যা, যশ, লক্ষ্মী, রূপ, জয়—এ সকলই আত্মবলে অর্জ্জন করতে হয়, প্রার্থনা-বলে নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ Ideal-এর মধ্যে ত self-sacrifice-এর

কথা নেই? তার উত্তরে আমি বলি, self-sacrifice কোনওজাতির আদর্শ হতে পারে না, জাতির পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে self-realisation. আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বহু লোকের পক্ষে self-realisation-এর ব্রত অবলম্বন করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যে-দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, সে বর্ত্তমান বাঙলা নয়, অতীত বাঙলাও নয়,—ভবিষ্যৎ বাঙলা, অর্থাৎ যে বাঙলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমার বাঙালী পেট্রিয়টিজম বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজমের বিরোধী নয়। আর এক কথা, যে-ন্যাসনালিজম বিদ্বেষবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ন্যাসনালিজমের ফলে শুধু পরের নয়, নিজেরও যে সর্ব্বনাশ হয়, গত ইউরোপীয় যুদ্ধ এই, সত্য, যার চোখ আছে তারই চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

(১)

জ্ঞান হয়ে অবধি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে মস্ত একটা প্রভেদ আছে, এইরকম একটা কথা শুনে আস্ছি। কিন্তু সে প্রভেদটা যে কি ও কোথায়, তা এতদ্দেশীয় কোন বক্তা কি লেখক আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেননি। অন্ততঃ আমার মন যে-সকল কথায় সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে, এমন কথা আমিত অদ্যাবধি কোনও স্বদেশী বক্তা কিম্বা লেখকের মুখে শুনিনি।

পূর্ব্ব-পশ্চিমের কথা উঠ্‌লেই, সূর্য্যের উদয়-অস্তের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। আর তার পিঠ পিঠ নানারকম উপমা এসে আমাদের নয়ন মন অধিকার করে বসে। যথা, সভ্যতার উদয় পূর্ব্বে, অস্ত পশ্চিমে। আলো আগে পূবে উঠে, তারপর পড়ে পশ্চিমে—ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে জিওগ্রাফির পূর্ব্ব অলক্ষিতে আমাদের মনে হিষ্টরির পূর্ব্ব হয়ে ওঠে, আর তখন আমরা দেশের ধর্ম্ম কালের উপর আরোপ করি, আর কালের ধর্ম্ম দেশের উপর। আর এর ধর্ম্ম ওর ঘাড়ে চাপাবার ফলে আমাদের মন চিন্তারাজ্যে দিশেহারা হয়ে যায়।

সত্য কথা এই যে, যখন আমরা পূর্ব্ব-পশ্চিমের কথা বলি, তখন আমরা ইউরোপ ও এসিয়ারই ভেদাভেদের কথা ভাবি। বর্ত্তমান ইউরোপের সঙ্গে বর্ত্তমান এসিয়ার অবশ্য কতকগুলো স্পষ্ট প্রভেদ আছে। সাংসারিক হিসেবে ইউরোপ সমৃদ্ধ, এসিয়া দরিদ্র। দেহেমনে যে-সকল গুণের সদ্ভাবে

মানুষের পলিটিক্যাল ও ইকনমিক ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, সে-সকল গুণ ইউরোপীয়দের দেহমনে যে-পরিমাণে আছে, আমাদের দেহমনে সে পরিমাণে নেই ; এটি তো প্রত্যক্ষ সত্য। এই মোটা সত্য থেকে একটা মোটা তথ্য জন্মলাভ করেছে। সে তথ্য এই যে—পূর্ব্ব হচ্ছে spiritual, এবং পশ্চিম materialistic.

(২)

Spirituality এবং Materialism, দু'টো কথাই আমরা বিলেত থেকে আমদানী করেছি। প্রমাণ—এ দুটি শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। Spirituality-র তরজমা আমরা সংস্কৃতের সাহায্যে কোনরকমে করতে পারি, কিন্তু তাও ভুল অনুবাদ হবে। সংস্কৃত আধ্যাত্মিক শব্দ ইংরেজী spirituality-র প্রতিশব্দ নয়। কিন্তু materialism-এর তরজমা করতে মোটেই পারিনে। সাংসারিক অভ্যুদয়সাধনের প্রবৃত্তি মানুষমাত্রেরই অন্তরে আছে ; সুতরাং সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার অক্ষমতার নাম spirituality নয়, আর ক্ষমতার নাম materialism নয়। কারণ materialism নামক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে কর্ম্ম-কুশলতার কোনও যোগাযোগ নেই ; এবং spirituality নামক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে অকর্ম্মণ্যতারও কোনও যোগাযোগ নেই।

বড় বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে। কারণ সে সব কথা নানা লোকে নানাভাবে হৃদয়ঙ্গম করে। কিন্তু সেই সব বিভিন্ন মনোভাবের একই নাম থেকে যায়, এবং সে নাম বাদ দিয়ে কোনও বিষয়ের আলোচনা করাও অসম্ভব। অথচ এই দার্শনিক কথাবার্ত্তা নিয়ে

নিয়ত আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা সেই আলোচনাসূত্রেই সেই কথাগুলোর অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

সুতরাং ধরে নেওয়া যাক্ যে—আমরা spiritual, এবং ইউরোপের লোক materialistic। এই ইউরোপীয় materialism-এর প্রভাব আমাদের মনের উপর কি সূত্রে কতদূর হয়েছে, এবং আমাদের spirituality-র প্রভাব ইউরোপীয় মনের উপর কি ভাবে কতটা হয়েছে, আর সে প্রভাবের ফল বিশ্বমানবের পক্ষে আশঙ্কার কথা কিম্বা আশার কথা—তাও বিবেচ্য।

(৩)

ইউরোপ যে কর্ম্মক্ষেত্র এবং এসিয়া যে ধর্ম্মক্ষেত্র, এইরকম একটা ধারণা উক্ত দুই ভূভাগের লোকের মনে অনেকদিন থেকে দিব্যি বসে গিয়েছে; এবং সে-কারণ ইউরোপের লোকেরা এই ভরসায় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এসিয়াতে কর্ম্ম নেই; আর আমরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলুম যে, ইউরোপে ধর্ম্ম নেই। দু'পক্ষই এই ভেবে মনস্থির করেছিলেন যে, কর্ম্মরাজ্যে এসিয়া ইউরোপের ঘাড়ে চড়্‌তে পারবে না—আর ধর্ম্মরাজ্যে ইউরোপও এসিয়ার ঘাড়ে চড়্‌তে পারবে না। একটা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য মত পেলেই মানুষে মনের আরামে থাকে। আর ইউরোপের লোক যে সব পুরুষ, ও এসিয়ার লোক যে সব মেয়ে, এর চাইতে সহজ ভাগ আর কি হ'তে পারে?

ফলে এসিয়ার কাছ থেকে ইউরোপের কোনও ভয় ছিল না। গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় বিধ্বস্ত হয়ে ইউরোপের মনে নানারকম ভয়ভাবনা

জন্মেছে। নিজেদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপের লোকের মনে যে অগাধ বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসের গোড়া আল্‌গা হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা নানাদিকে নানারূপ বিভীষিকা দেখ্‌ছে। ইউরোপের, বিশেষতঃ ফরাসীদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, এসিয়া এখন সে দেশের সাহিত্যিক মনের অনেকটা অংশ অধিকার করেছে। যে-সকল ইউরোপীয়েরা এখন ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবেন, তাঁরা এসিয়ার কথা বাদ দিয়ে ইউরোপের ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারেন না। ফলে নিজের নিজের প্রকৃতি ও বুদ্ধি অনুসারে, কেউ বা এসিয়ার সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার পরিপন্থী মনে করেন, কেউ বা তাকে আবার তার সহায় মনে করেন।

(৪)

এই উভয় শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে মতের অনৈক্য কোথায় এবং কি কারণে, তা ফরাসীদেশের দুটী গণ্যমান্য সাহিত্যিকের লেখায় খুব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। আমি সংক্ষেপে উভয়ের বাদানুবাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। কারণ এদেশে যাঁরা পূর্ব্ব-পশ্চিমের ভেদাভেদ নিয়ে মাথা বকান, পশ্চিমের লোকেরা সে বিষয়ে কি ভাবছে, তা জানবার জন্য আশা করি তাঁদের কৌতূহল আছে।

H. Massis বর্ত্তমান ফ্রান্সের জনৈক ধনুর্দ্ধর লেখক। তিনি প্রথমে ছিলেন Renan ও Anatole France-এর মন্ত্রশিষ্য। পরে তিনি আরিষ্টটেল ও যীশুখৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাই তিনি এখন তাঁর পূর্ব্ব শিক্ষাগুরু ও সতীর্থদের উপর নির্ম্মমভাবে সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ করছেন। তাঁর সমালোচনার বাণ উক্ত সাহিত্যিকদের বধ না

করতে পারুক, কিছুকিঞ্চিৎ জখম যে করেছে, সে বিষয়ে ফ্রান্সের সাহিত্য-সমাজে দ্বিমত নেই। Masis প্রথমতঃ অতি চটকদার লেখক। উপরন্তু খৃষ্টান ধর্ম্ম ও খৃষ্টান দর্শনে তাঁর বিশ্বাস অটল। এই বিশ্বাসের বলেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং মারাত্মক লেখক হয়ে উঠেছেন। তাই যাঁরা তাঁর মতাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করছেন যে, তাঁর মতামতের ভিতর অনেক নিগূঢ় সত্য আছে। তবে সকলেই বলেন তাঁর দোষ এই যে, অবিশ্বাসী সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর কোনরূপ মায়ামমতা নেই। দ্বিতীয় কুমারিল ভট্টের মত তিনিও ফরাসী সাহিত্যরাজ্যে নাস্তিক নিগ্রহ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। ইনি সম্প্রতি "ইউরোপের আত্মরক্ষা" নামক একখানা বই লিখেছেন। উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন Edmond Jaloux নামক জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক। সাহিত্য সমালোচনা যে কা'কে বলে, Jaloux-র সমালোচনাকে তার আদর্শ বলা যায়। "উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"—এ কথা যে সাহিত্যরাজ্যেও খাটে, তার জীবন্ত প্রমাণ হচ্ছেন উক্ত সমালোচক।

(৫)

Massis মহোদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইউরোপ ধ্বংসপথের যাত্রী হয়েছে। তাই তিনি ইউরোপকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে আত্মরক্ষার অর্থ—আত্মার রক্ষা। তাঁর বিশ্বাস পৃথিবীর প্রতি জাতেরই একটী বিশেষ নিজস্ব আত্মা আছে, আর স্বকীয় আত্মার সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করারই নাম আত্মরক্ষা। কারণ কোনও জাতি যদি তার আত্মাকে সজীব ও সুস্থ রাখতে পারে, তাহ'লে সে জাত জীবনেও সুস্থ ও সফল হতে বাধ্য।

তাঁর মতে ইউরোপীয় মন যুগযুগ ধরে গ্রীকসাহিত্য ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় মনের যা-কিছু শক্তি, যা-কিছু সৌন্দর্য্য, যা-কিছু মহত্ত্ব আছে, সে সবই ঐ দুই প্রভাবের ফল। ইউরোপের লোক প্রায় দু'হাজার বৎসর ধরে এই শিক্ষা লাভ করেছে যে, এ বিশ্বের মূলে আছেন ভগবান, এবং তিনি হচ্ছেন মঙ্গলময় পুরুষ, ভাষান্তরে সগুণ ঈশ্বর। ইউরোপের লোক যে কর্ম্মজগতে এত ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে, তার কারণ, সকল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করাই ইউরোপের যথার্থ আদর্শ। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, যুগযুগ ধরে ইউরোপের লোক শুধু ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেছে। অধিকাংশ মানুষ শুধু নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়েই কর্ম্ম করে; ইউরোপের অধিকাংশ অধিবাসী তাই করেছে। কিন্তু আমাদের যে-সকল প্রবৃত্তি পশু-সামান্য, তারই চরিতার্থ করাটা আমরা পূর্ব্বে কখনো সভ্য মনোভাব বলে গ্রাহ্য করিনি। যে মনোভাবকে পূর্ব্বে ইউরোপের মনীষিবৃন্দ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ মনে করতেন, সে মনোভাব হচ্ছে—ভগবৎশক্তি এবং ভগবৎঅনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভর; এবং বহুকাল ধরে Roman Catholic Church ইউরোপের মনকে এই সত্য ভুলতে দেয়নি, তার কড়া শাসনের বলে।

(৬)

ইউরোপের এই আদর্শের উপর প্রথম ধাক্কা লাগায় ইটালীর Renaissance, তারপর জর্ম্মাণীর Reformation। Renaissance আত্মার চাইতে বুদ্ধির, অন্তরের চাইতে বাহ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করলে; আর Reformation authority-র চাইতে liberty-র শ্রেষ্ঠত্বের বাণী

প্রচার করলে। এর ফলে সাধারণ লোকে বুঝলে যে, authority না মানার নামই liberty। মানুষ নামক পশু authority মেনেই, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির বহির্ভূত অনেক সত্য অর্থাৎ মনোভাবকে মেনে নিয়েই যে মানুষ হয়, এ কথা ইউরোপের অধিকাংশ লোক ভুলতে আরম্ভ করলে। আর সেই অবধি liberty-র অর্থ হল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার স্বাধীনতা। এই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার অধোগতির প্রথম পদ।

এখন আবার এসিয়ার মনোভাব ইউরোপের মন অধিকার করছে, এবং সে মনোভাবের বশবর্ত্তী হলে ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। এসিয়ার মনোভাব অবশ্য materialistic নয়। মনোজগতে ইউরোপের উপর এসিয়ার আক্রমণ হচ্ছে ইউরোপীয় spirituality-র উপর এসিয়াটিক spirituality-র আক্রমণ। আসলে materialism-এর চাইতে এ ঢের প্রবল শত্রু। কারণ ইউরোপীয় materialism-এর শূন্যগর্ভতা প্রমাণ করা তেমন কঠিন নয়। Renan, Anatole France, Gide, Romain Rolland প্রভৃতির বাণী সবই অন্তঃসারহীন। কারণ এঁদের সকলেরই আত্মা ক্ষুদ্রাত্মা। কিন্তু এসিয়ার spirituality-র অবতার হচ্ছেন চীনের Lao-t-se আর ভারতবর্ষের বুদ্ধ। এ দু'জনেই মহাপুরুষ ও অসামান্য মহৎ অন্তঃকরণের ব্যক্তি। এদের কথাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা চলে না। কিন্তু তাহ'লেও এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বুদ্ধ ও লাউট্‌সের মতের বশবর্ত্তী হলে ইউরোপীয় মনোরাজ্যে অরাজকতা ঘটবে।

(৭)

Massis-র মতে বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমত যার মনে বসবে, সে ভালমন্দ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য, অবশ্য সে যদি logical হয়।

আর কর্ম্মযোগী হওয়াই ইউরোপের বড় আদর্শ। তা ছাড়া এসিয়ার দর্শনের সার কথা হচ্ছে অহং (subject) এবং ইদং (object)-এর অভেদজ্ঞান। অপরপক্ষে ইউরোপের মন এ দুয়ের একান্ত ভেদজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

এখন জিজ্ঞাস্য যে—এই এসিয়াটিক মনোভাব ইউরোপীয় মনের অন্তরে কোন্ ছিদ্র দিয়ে কি সূত্রে প্রবেশ কর্‌ছে ?

Massis বলেন—প্রথমত জর্ম্মাণীর, দ্বিতীয়ত রাষিয়ার মারফৎ।

শনিমঙ্গলবারের মড়া দোসর খোঁজে। গত যুদ্ধের পর জর্ম্মাণী যখন আবিষ্কার করলে তার স্বার্থান্ধ সভ্যতা ম্রিয়মাণ হয়েছে, তখন সে বাদ-বাকী ইউরোপীয়দের ধ্বংসপথের যাত্রী করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ল। জর্ম্মাণী কামানের গোলা দিয়ে যখন ইউরোপকে মারতে পারলে না, তখন সে সাহিত্যিক poison-gas দিয়ে ইউরোপীয়দের মোহাচ্ছন্ন করবার চেষ্টা সুরু কর্‌লে। আর আমাদের মন ও চরিত্র দুর্ব্বল করবার তারা অব্যর্থ উপায় ঠাউরেছে, এসিয়ার ধর্ম্মমত ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রচার করা। তারা সকলে আমাদের বোঝাচ্ছে যে, মুক্তির মানে নির্ব্বাণ, আর নির্ব্বাণপ্রাপ্তিই ইউরোপীয়দের আদর্শ হওয়া উচিত। Spengler, Keyserling প্রভৃতি এ যুগের জর্ম্মাণ দার্শনিকেরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

আর রুষ সাহিত্যেরও প্রধান কথা হচ্ছে যে, ইউরোপ এতদিন ধরে যে সভ্যতার সাধনা করে এসেছে, তার ষোল কড়াই কাণা। ধর্ম্ম রীতিনীতি প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিলেই মানুষ দেবতা হয়ে উঠবে, এই হচ্ছে রুষ সাহিত্যের বাণী। আর রাষিয়ানরা যে এসিয়াটিক, তা সকলেই জানে। এ ছাড়া ফ্রান্সের বহুলোক আজ Lao-t-se ও বুদ্ধের ভক্ত হয়ে উঠেছে।

(৮)

এখন এর উত্তরে Jaloux কি বলেন শোনা যাক্। তিনি বলেন যে, Massis-র রচনাচাতুর্য্য এতই অপূর্ব্ব এবং তাঁর চিন্তা এতই সুশৃঙ্খলিত যে, তাঁর লেখা প্রথমেই মনকে অভিভূত করে, এবং তখন মনে হয় যে, তাঁর সকল কথাই ত সত্য। লেখক হিসাবে মাসির শক্তির মূলে আছে, তাঁর ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি জিনিষে অটল বিশ্বাস। তাঁর মনে কোনরূপ সন্দেহ নেই। যার মনে কোনরূপ দ্বিধা নেই, সে ব্যক্তির অদম্য শক্তির পরিচয় কর্ম্মজগতেও যেমন পাওয়া যায়, মনোজগতেও তেমনি। কিন্তু আমাদের মন যখন নানা বিষয়ে সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান, তখন মাসির কথার মোহ কেটে গেলেই আমাদের মনে নানারূপ প্রশ্ন ওঠে। তিনি আমার মনে যে সকল জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছেন, একে একে সেগুলি প্রকাশ করছি।

ইউরোপের বর্ত্তমান মনোভাব দেখে মাসি যে ভয় পেয়েছেন, সে ভয় অকারণ নয়। বর্ত্তমান ইউরোপের লোকের প্রকৃতি যে মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়্‌ছে, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। এমন কি ইউরোপের যে-দলের লোক সব চাইতে জ্ঞানান্ধ—অর্থাৎ politician-রা—গত যুদ্ধের ধাক্কা খেয়ে তাঁরাও চোখ মেলে দেখছেন যে, যাকে তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতা বলেন, তার অন্তরে ঘুণ ধরেছে। কিন্তু আমাদের এই অধোগতির জন্য এসিয়া কি হিসেবে দায়ী, তা ঠিক বোঝা গেল না।

এসিয়ার কথা মনে করতে মাসির মন কি জন্য আতঙ্কে ভরে ওঠে? তিনি কি ভয় পান— এসিয়া আমাদের বাহুবলে পঙ্গু কর্‌বে, না মন্ত্রবলে নির্জ্জীব কর্‌বে? তাঁর ভয়টা পলিটিকাল না দার্শনিক?— মাসি হয় ত

উত্তরে বলবেন যে, মানুষের দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে পলিটিকাল মনোভাবের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ।

দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে পলিটিকাল মনোভাবের যে একটা সুদূর ও অস্পষ্ট যোগাযোগ আছে, এ কথা স্বীকার করলেও, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, দার্শনিক মন ও পলিটিকাল মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জ্ঞান ও কর্ম্মের অভেদ জ্ঞান আমার আজও হয়নি। সে যাই হোক্, পলিটিকাল হিসাবে এসিয়া ইউরোপের স্কন্ধে ভর করবে কি না, সে বিষয়ে কোনরূপ মত দিতে আমি সম্পূর্ণ অপারগ। কারণ, এত অসংখ্য ও অজ্ঞাত ঘটনার সমবায়ের উপর এই দুই ভূভাগের পলিটিকাল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যে, ভবিষ্যতে ইউরোপ যে এসিয়ার দাস হবে, এ ঘটনা ঘটা যেমন সম্ভব, তেমনি অসম্ভব। আর যদিই বা তাই হয়, তাহলেই যে সৃষ্টির ধ্বংস হবে, তা ত মনে হয় না।

ও-সব ভাবনা ভাবতে গেলে মানুষের দার্শনিক মন ঘুলিয়ে যায়। সুতরাং ইউরোপের পলিটিকাল সমস্যার মীমাংসা পলিটিসিয়ানরা করুন; আমরা মাসি মহোদয় যে দার্শনিক বিপদের কথা বলেছেন, তারই বিচার করব।

(৯)

জার্ম্মানী ও রুষিয়ার এসিয়াটিক্ মনোভাবের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্। মাসি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনের যে পরিচয় দিয়েছেন, সংক্ষেপে তারই বিচার করা যাক। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমারও নেই, মাসিরও নেই। আমরা উভয়েই গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সাহিত্যেই শিক্ষিত হয়েছি। তবুও জিজ্ঞাসা করি—তিনি হিন্দু

মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর মতামত কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? ঋগ্বেদ থেকে, না গান্ধীর কাছ থেকে, না Romain Rolland-র বই পড়ে? তিনি যার কাছ থেকেই তা সংগ্রহ করুন, তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনের যে বর্ণনা করেছেন, তা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্ত সার ত নয়ই, এমন কি তা caricature পর্য্যন্ত নয়। এমন কথা আমি বলতে সাহসী হয়েছি, কারণ বুদ্ধের বাণী আমার কাণে লেগে আছে। আমি ফ্রান্সের সেই intellectual দলের অন্যতম,যাদের অন্তরে বুদ্ধ-বচন বিশেষ করে ঘা দেয়। Massis আরও বলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতর সে রস নেই, যে রস বিশ্ব-মানবের মন সরস করতে পারে। আমরা দেশশুদ্ধ লোক যে হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন, তার জন্য দায়ী ইউরোপের Orientalist-রা। এই Orientalist-দের দল দার্শনিকও নয়, 'আর্টিষ্ট'ও নয়; তাঁরা প্রায় সকলেই Philologist মাত্র। কাজেই এই সব পণ্ডিতের লেখা তাঁদের সমব্যবসায়ী পণ্ডিতের দলেরই পাঠ্য। আর এঁরা যখন philology ছেড়ে হিন্দু সভ্যতার ব্যাখ্যান সুরু করেন, তখনই ধরা পড়ে যে, কোনও বড় জিনিষ এঁদের ধারণার বহির্ভূত। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের একজন বড় Orientalist, Sylvain Levi-র কথা ধরা যাক্। Levi বলেছেন যে, হিন্দু-দর্শন ও হিন্দু-সাহিত্যের, ভারতবর্ষের বাইরে কোনও সার্থকতা নেই। তার ভিতর এমন কিছুই নেই, যা সকল দেশের সর্ব্বকালের মানুষের মনকে উন্নত করতে ও আনন্দ দান করতে পারে; যেমন পারে গ্রীক্ সাহিত্য। আমি জিজ্ঞাসা করি—এ সব কথার কি কোনও অর্থ আছে? হোমারের ইলিয়াড যদি সকলের মনের জিনিষ হয়, তবে বাল্মীকির রামায়ণই

বা তা হবেনা কেন? রামায়ণ যে কাব্য হিসাবে সত্য-সত্যই একটি মহাকাব্য, তা উক্ত কাব্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি কখনই অস্বীকার করতে পারবেন না; অবশ্য কাব্য কাকে বলে, সে সম্বন্ধে যদি তাঁর কোনরূপ ধারণা থাকে। আমরা যে 'ইলিয়াডের' এতদূর ভক্ত, তার কারণ ছেলেবেলা থেকে আমরা তা পড়তে বাধ্য হয়েছি। হোমার পড়া আমাদের কলেজী শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। আর রামায়ণের উপর আমাদের যে কোনরূপ ভক্তি নেই, তার কারণ—রামায়ণ আমাদের কেউ পড়ায়নি, আমরাও অধিকাংশ লোক তা পড়িনি। গ্রীক সাহিত্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, কেননা সে সাহিত্য আমরা জানি; আর ছেলেবেলা থেকে সে সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের গুরুরা আমাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। Massis যে Sylvain Levi-র মত Orientalist-দের কথায় আস্থা স্থাপন করে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিচার করেছেন, তাতেই তিনি তার উপর অবিচার করতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রীক মন উদার আর হিন্দু মন সঙ্কীর্ণ, এমন কথা বলায় ইউরোপীয় মনের উদারতা নয়, সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

(১০)

এখন হিন্দুদর্শনের কথা যাক্। Massis-র বিশ্বাস যে, ইদং এবং অহংয়ের অভেদজ্ঞানের নিরাকার ভিতের উপরেই হিন্দু সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এত বড় একটা metaphysics-এর মতবাদ যে ভারতবর্ষে সর্ব্বলোকসামান্য, এ কথা মানা কঠিন; কারণ অধিকাংশ লোক দ্বৈতবাদ

কিম্বা অদ্বৈতবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করে তারপর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে আরম্ভ করে না। ধরে নেওয়া যেতে পারে পৃথিবীর অপর দেশেও যেমন, ভারতবর্ষেও তেমনি metaphysics-এর সমস্যা আছে, শুধু metaphysician-দের কাছে। অন্যান্য দেশেরও যেমন, সে দেশেরও তেমনি সভ্যতা গড়ে উঠেছে বহুবিধ মানব মনোভাবের উপর। যে ধর্ম্মমতকে Massis ইউরোপীয়দের একচেটে মনে করেন, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষে তার সন্ধান মিলবে। এক দেশের লোক যে আগাগোড়া কর্ম্মযোগী, আর অপর এক দেশের লোক যে আগাগোড়া জ্ঞানযোগী, এরকম রূপকথায় ছোট ছেলেরাই শুধু বিশ্বাস করে। আর যদি তাই হয় ত, ইউরোপের জন্য Massis-র কোনও ভয় নেই। ইউরোপের সব লোক—মায় কুলিমজুর, পলিটিসিয়ান, কলওয়ালা—সবাই যে জ্ঞানযোগী হয়ে উঠবে, তার কোনও সম্ভাবনা নেই। বর্ত্তমান ইউরোপ যে তার পূর্ব্ব spiritual সভ্যতা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ, তারা সব অতিমাত্রায় materialism-এর ভক্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং তারা যে আবার হিন্দু spirituality-র বশবর্ত্তী হবে তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই—সম্ভাবনা আছে শুধু আর এক বিপদের। সে বিপদ এই যে, নবীন এসিয়ার লোক সব নকল ইউরোপীয়ান হয়ে উঠবে। আমাদের ব্যবহার দেখে ও আমাদের দত্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে, তারাও সব পলিটিক্স্ ও industrialism-এর মহাভক্ত হয়ে উঠবে, আর তখন বুদ্ধদেবের বাণী এসিয়ার কোনও লোক আর প্রচারও করবে না, কেউ তার প্রতি কর্ণপাতও করবে না। ইউরোপই এখন এসিয়ার মনকে বিপর্য্যস্ত করছে; এসিয়া বেচারা ইউরোপের মন ঘুলিয়ে দিচ্ছে না।

(১১)

ইউরোপে বুদ্ধদেবের বাণী মর্ম্মস্পর্শ করেছে, শুধু জনকতক সাহিত্যিকের ও আর্টিষ্টের। এ জাত ইউরোপের সর্ব্বনাশ করবে না, কারণ তাদের এই জ্ঞানটুকু আছে যে, তারা ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা নয়। ইউরোপের এ যুগের ভাগ্যনিয়ন্তা হচ্ছে নব বুদ্ধিপৌরুষহীন পলিটিসিয়ান ও কলকারখানার মালিক ; আর গুরু-পুরোহিত হচ্ছে সেই দলের লোকেরা, যারা বিজ্ঞানদর্শনের বড় বড় কথার দোহাই দিয়ে মানুষের সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে। সুতরাং আমাদের মত সাহিত্যিক ও আর্টিষ্টদের মনোভাবের কোনও প্রভাব এ সমাজের উপর হবে না।

বর্ত্তমান ইউরোপ যে নীচাশয়তার পঙ্কে নিমগ্ন হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। এ পাঁক থেকে ইউরোপের মনকে কে টেনে তুলবে ?— Massis-র বিশ্বাস Roman Catholic Church। ইউরোপের মন কামনার বিষে জর্জ্জরিত, সুতরাং তার মন থেকে কামিনী-কাঞ্চনের উন্মত্ত কামনা দূর করতে না পারলে তাকে আবার সুস্থসবল করতে পারা যাবে না। Massis-র বিশ্বাস এ রোগের চিকিৎসক হচ্ছে Church, কারণ Church-এর মূলমন্ত্র হচ্ছে ত্যাগ (renunciation)। Church যে আবহমান কাল ত্যাগের ধর্ম্ম প্রচার করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা করেছে শুধু আংশিক ভাবে। Church-এর ত্যাগধর্ম্মের ভিতর অনেকখানি বিষয়বুদ্ধির ভেজাল চিরকাল ছিল, আজও আছে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাত শুধু পূর্ণ ত্যাগধর্ম্মের মহিমা স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করেছে। বুদ্ধ মানুষের শুধু ঐহিক নয়, পারলৌকিক অভ্যুদয়ের বাসনাকেও নির্ম্মূল করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন ; হিন্দু দার্শনিকরাও তাই করেছেন। বুদ্ধের

বাণী যদি ইউরোপীয় সামাজিক লোকের মনে বসে, তাহলে তারা বৌদ্ধ হবে না, হবে শুধু Massis-র আদর্শ খৃষ্টান।—ইউরোপের মনকে যদি বৌদ্ধধর্ম্মের বরফজলে নাইয়ে তোলা যায়, তাহলে সে মন আবার সুস্থ, সবল ও সুন্দর হবে।

(১২)

আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে দুটি ফরাসী সাহিত্যিকের পূর্ব্বপশ্চিম সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করলুম। পাঠকমাত্রেই দেখতে পাবেন যে, এঁরা কেউ নির্ব্বোধ নন। শুধু Massis হচ্ছেন বীরপ্রকৃতির লেখক, আর Jaloux শান্তপ্রকৃতির।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, Massis-র ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, আর Jaloux-র ভয়ই সকারণ। বর্ত্তমান ইউরোপের মনে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের ছোপ লাগবার কোনই সম্ভাবনা নেই। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—এ কথা ইউরোপের কানে ঢুকবেনা। বর্ত্তমান ইউরোপের materialism-ই নবীন এসিয়ার মনকে মুগ্ধ করতে পারে। কারণ এ materialism দার্শনিক materialism নয়, ব্যবহারিক materialism। এ materialism সাংখ্য দর্শনের "প্রধান বাদ" নয়, চার্ব্বাকদর্শনের প্রধান কথা ; এবং চার্ব্বাকের মতে "নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাদেব পুরুষার্থৌ"। এ নীতির মানে পলিটিকস্ এবং ইকনমিকস্। আর এ মত যে সর্ব্বলোকসামান্য, তা প্রাচীন হিন্দুরা জান্‌তেন ; এ মতকে তাঁরা "লোকায়ত" বলেছেন।

শ্রাবণ ১৩৩৪

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ?*

১

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ?—এ প্রশ্ন আজকাল য়ুরোপীয়েরাও জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন। এ প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, সে সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপের কোন জহরীর মনে কোনরূপ দ্বিধা আছে। অবশ্য য়ুরোপীয় বিশেষণটি বাদ দিয়ে সভ্যতা বস্তুটি যে কি, সে প্রশ্ন সে দেশের কোন লোকের মনে উদয় হয় না। এর কারণ বোধহয় এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, যার নাম য়ুরোপীয় সভ্যতা, তার নামই সভ্যতা ; আর যার নাম সভ্যতা, তার নামই য়ুরোপীয় সভ্যতা। এ ধারণা যাদের মজ্জাগত, তাদের মধ্যে এ প্রশ্ন ওঠে কেন ?

য়ুরোপের গত যুদ্ধ সে দেশের লোকের আত্মপ্রসাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। উক্ত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় হঠাৎ জেগে উঠে তারা এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছে। য়ুরোপের লোক পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরণের মুখে অগ্রসর হয়েছিল ; সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠে এখন তাদের প্রধান ভাবনা হয়েছে, কি ক'রে তারা ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা

---

* "What is European Civilisation"—by Wilhelm Haas, Professor of the Technological College Charlottenburg, and Lecturer of the Deutsche Hochschule *für* Politik.

করবে। ফলে সকল জাতিকে এক দলবদ্ধ করবার চেষ্টা সে দেশের পলিটিসিয়ানরা করছেন। পরস্পরের স্বার্থের সংঘর্ষ দূর না করতে পারলে যে সকলের স্বার্থরক্ষা করা যাবে না, এ ধারণা অনেকের মনে জন্মেছে।

কিন্তু মনোরাজ্যে ঐক্য স্থাপন না করতে পারলে য়ুরোপীয়ের জীবনে যে ঐক্য থাকবে না, ধ'রে বেঁধে যে ফ্রান্সের সঙ্গে জর্ম্মাণীর পিরীত করানো যাবে না,—এই মোটা সত্যটি সে দেশের সূক্ষ্মদর্শী লোকদের চোখে পড়েছে। ফলে স্বদেশের ও স্বজাতির শুভকামী ও মহদাশয় ব্যক্তিরা য়ুরোপের প্রতি তাঁদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত ক'রে আবিষ্কার করেছেন যে, য়ুরোপীয়েরা আসলে সকলেই মনে ও চরিত্রে এক; যে সব বিষয়ে তাদের প্রভেদ আছে, সে-সব সভ্যতার অঙ্গও নয়, ফলও নয়। তাঁরা নিজে যা আবিষ্কার করেছেন, সেই সত্যটি পাঁচজনকে দেখিয়ে দিলেই তাঁদের মতে য়ুরোপের বাঘে-বকরীতে এক ঘাটে জল খাবে। আর গত যুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে মহা সুফল ঘটেছে এই যে, য়ুরোপীয় মনের মূলগত ঐক্যের প্রতি সকল জাতির চোখ এখন ফোট'-ফোট' করছে।

২

প্রথমেই এ বিষয়ে জনৈক জার্ম্মাণ পণ্ডিতের মত শোনা যাক্। Dr. Haas য়ুরোপের এক জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, এবং সেই সঙ্গে সহজ দার্শনিক। কারণ, তিনি জাতিতে জর্ম্মাণ। যে ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই যেমন শঙ্করের অংশ-অবতার, তেমনি যে জর্ম্মাণীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেও Kantএর অংশ-অবতার। ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে আধ্যাত্মিক

হওয়া যেমন সহজ, জার্ম্মাণদের পক্ষেও ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, দার্শনিক হওয়া তেমনি সহজ। একাধারে যিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, তাঁর কথা মন দিয়ে শোনা উচিত।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বৈদান্তিকরা যখন বলেন যে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", তখন মীমাংসকেরা উত্তরে বলেন, এ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? ব্রহ্ম যদি থাকেন ত এত বড় সত্য সম্বন্ধে কার জ্ঞান নেই? দ্বিতীয়তঃ এ জিজ্ঞাসার ফলই বা কি? মানুষের কর্ম্ম-জীবনের উপর এ জ্ঞানের ফল কি?

এ যুগেও তেমনি য়ুরোপের কর্ম্মীর দল, "য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি?—" এ প্রশ্ন শুনে এ কথা বলতে পারেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ব'লে যদি কোন বস্তু থাকে ত, সেই প্রকাণ্ড জল-জ্যান্ত সত্যের প্রতি কে অন্ধ? আর তার গূঢ় মর্ম্ম জেনেই বা কার কি লাভ? এ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের কর্ম্মজীবনের কি ইতরবিশেষ করবে?

আর যদি জনসাধারণের কথা বল ত, এ জ্ঞান লাভ করায় তাদের কি লাভ? তারা ত য়ুরোপীয় সভ্যতার ফলভোগী মাত্র। হিন্দুস্থানীরা বলে, "আম খাও, পেঁড় মত খোঁজ"; উক্ত উপদেশ অনুসারে তাদের য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ জানবার ও মূল অনুসন্ধান করবার কোনই প্রয়োজন নেই। "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও" বলেই নিশ্চিন্ত থাকা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব জিজ্ঞাসা যে নিষ্ফল, এ আপত্তি চারিধার থেকে উঠবে। এ আপত্তির খণ্ডন না ক'রে কোনও দার্শনিক অগ্রসর হ'তে পারেন না। সেকালে শঙ্করও পারেন নি, একালে Haasও পারেন নি।

৩

এখন এ জিজ্ঞাসার সার্থকতা কি, তা Deutsche Hochschule *für* Politikএর শিক্ষকের মুখে শোনা যাক্। য়ুরোপীয়েরা যে প্রকৃতপক্ষে এক জাতি, এ বিষয়ে য়ুরোপের সকল জাতির সজাগ হওয়া উচিত, নচেৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। তিনি বলেছেন যে, অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে—"Europe has reached a turning-point in its history and that it must collect its forces for a decisive struggle against Asia or other important enemies." অর্থাৎ জ্ঞাতি-শত্রুতায় বলক্ষয় না ক'রে য়ুরোপের বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য হচ্ছে, তার সম্মিলিত শক্তির দ্বারা বহিঃশত্রুকে পরাভূত করা; আর এই বহিঃশত্রু হচ্ছে এসিয়া। কারণ, other important enemies যে কারা, সে কথাটা উহ্য রয়ে গিয়েছে।

যেমন উক্ত জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতে সমগ্র য়ুরোপ একমন, একপ্রাণ, তেমনি তাঁর বিশ্বাস, সমগ্র এসিয়াবাসীরাও একমন ও একপ্রাণ; আর সে মনের একমাত্র প্রবৃত্তি হচ্ছে, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সমূলে বিনাশ করা। এ হচ্ছে ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ কাইসরের প্রসিদ্ধ আবিষ্কার। কারণ, এসিয়াবাসীরা যে য়ুরোপের মারাত্মক শত্রু, তার কোনও বাহ্য প্রমাণ নেই। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যে-এসিয়া মারবে—সে-এসিয়া বোধ হয় এখন গোকুলে বাড়ছে; কারণ, তার সন্ধান সকলে জানে না।

এ সব কথা শুনে মনে হয়, এসিয়ার উপর য়ুরোপের যে বর্ত্তমান আধিপত্য আছে, ভবিষ্যতে তা নষ্ট হ'তে পারে, এই ভয়েই য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সম্প্রদায় আকুল হয়েছেন। এসিয়ার অভ্যুদয়

হ'লেই যে য়ুরোপ অধঃপাতে যাবে, এই বোধহয় জর্ম্মাণ দর্শনের স্থির-সিদ্ধান্ত। আমার ছেলে বাড়লেই যে তোমার ছেলে বামন হবে—এ সত্য কোন্ লজিকের হাতে ধরা পড়ে, তা আমার অবিদিত। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিকরা যাকে Conservation of energy বলেন, তারই যোগ-বিয়োগের নিয়মানুসারে।

কিন্তু সে যাই হোক, পণ্ডিতমহাশয়ের বক্তব্য বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর অপর ভূভাগের উপর যদি মালিকী-স্বত্ব বজায় রাখতে হয় ত, য়ুরোপীয়দের দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, এবং এই কারণেই তাঁর মতে "League of Nations, Disarmament, Economic conferences. Intellectual co-operation" প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয়েরা যে মনে এক, তা প্রমাণ না করতে পারলে তাদের জীবনে এক করা যাবে না। অতএব য়ুরোপীয় মনের মূল ঐক্যের সন্ধান নিতে হবে।

৪

য়ুরোপীয়দের বিশেষত্ব কোথায়, তার সন্ধান নিতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার, য়ুরোপ বলতে কি বোঝায়? তাই অধ্যাপক Haas প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন,—"What is Europe?"

তাঁর মতে য়ুরোপের অর্থ, একটি বিশেষ ভূভাগ নয়; কেন না, পুরাকালে ভৌগোলিক হিসেবে য়ুরোপের যে স্বাতন্ত্র্যই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে সে স্বাতন্ত্র্য নেই, অন্ততঃ থাক্‌বে না। কারণ "Everything connected with space, position and distance is steadily dwindling in importance."

এ সত্যটি য়ুরোপীয়দের স্মরণ করিয়ে দেবার আবশ্যক ছিল। কারণ, গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা প্রমাণ করেছিলেন যে, য়ুরোপীয়দের মাহাত্ম্যের মূলে আছে য়ুরোপের মাটি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন যে, "বিলেত দেশটা মাটির।" ও-কথা শুনে আমরা হেসে কুটি-কুটি হয়েছিলুম, কিন্তু য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে, বিলেত দেশটা মাটির হ'লেও, যে-সে মাটির নয়—একেবারে বিলেতী মাটির। অতএব তা নির্গুণ নয়, সগুণ। আমরাও দেখতে পাই যে, নেংড়া-আমের আঁঠি বাংঙলায় পুঁতলে সে আঁঠির গাছে আম ফলে না, ফলে আমড়া। মাটির গুণের ভক্ত হবার জন্য, বৈজ্ঞানিক হবার প্রয়োজন নেই, কবি হলেই আমরা ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে "আমার দেশ" বলতে বলতে দশাপ্রাপ্ত হতে পারি। অনেক ছেলেমি কথা পাকামি ক'রে বল্লেই যে তার নাম হয় বৈজ্ঞানিক-দর্শন, তার পরিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় শাস্ত্রে দেদার মেলে। সুতরাং য়ুরোপের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়কে, এ কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, একমাত্র মাটির উপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

অবশ্য অধ্যাপক Haas যে ঠিক কি বলেছেন, তা বোঝা যায় না। দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করবার কৌশল আজ মানুষের করায়ত্ত। তাই ব'লে নানাদেশের যে position বদ্লে গেছে, তা নয়—অবশ্য position ব'লে বস্তুর যদি কোন অবস্থা থাকে। নব-অঙ্কের ঠেলায় here শুন্ছি now হয়ে গিয়েছে। সে যাই হোক, বিলেতও ভারতবর্ষ হয়ে যায়নি, ভারতবর্ষও বিলেত হয়ে যায়নি। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের physical ব্যবধান কমে গিয়েছে বলেই, তাদের ভিতর psychological

ব্যবধানটা ফুটিয়ে তোলাই বোধহয় অধ্যাপক মহাশয়ের উদ্দেশ্য। কারণ, এসিয়ার সঙ্গে য়ুরোপের decisive struggleএর জন্য স্বদেশের যুবকদের মন প্রস্তুত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা মানুষের গুণাগুণের মূল সন্ধান করেছিলেন, এবং তা পেয়েছিলেন মাটির অন্তরে। বলা বাহুল্য যে, এ প্রবন্ধে আমি বাঙলা মাটিশব্দ সংস্কৃত পঞ্চভূত অর্থেই ব্যবহার করছি। আর বছর পঞ্চাশেক আগে আমি যখন স্কুলে পড়তুম, তখন সেকালের B. A., M. A.রা ভক্তিভরে Buckle's History of Civilization পড়তেন; আর সেই পুস্তকেই শুনতে পাই, সভ্যতার চরম আধিভৌতিক ব্যাখ্যা আছে।

তারপর পণ্ডিতরা আবিষ্কার করলেন, সে ব্যাখ্যা অচল। একমাত্র জিওগ্রাফিই যে সভ্যতা গড়ে, এ কথা সত্য নয়। কারণ, তা যদি হয়, তা হ'লে Red-Indianদের সঙ্গে বর্ত্তমান Americanদের সভ্যতার অর্থাৎ কৃতিত্বের আকাশ-পাতাল প্রভেদ হত না। এর থেকে দেখা যায় যে, মানব-সভ্যতার অন্তরে soil নয়, race; ক্ষেত্র নয়, বীজই প্রবল। ক্ষেত্র ও বীজের বলাবলের বিচার মনুতেও আছে; অর্থাৎ এ সমস্যা বহু পুরাতন।

এই বস্তাপচা বিচার ethnology, anthropology প্রভৃতি নাম ধারণ ক'রে নব বিজ্ঞানরূপে পরিচিত হল। এই নব বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করলেন যে, মানবজাতির মধ্যে Aryan নামে এক দেবজাতি আছে।

সেই জাতিই মানবসভ্যতা অতীতে গড়েছে, আর ভবিষ্যতেও গড়্‌বে। কারণ, progress করা তাদের জাতিধর্ম্ম। আর এই জাতি মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল উত্তর-জর্ম্মাণীতে। মানুষের মধ্যে য়ুরোপীয়রা শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাদের ধমনীতে নীললোহিত আর্য্যশোণিত তেড়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এ বিষয়েও তাদের মনে এখন সন্দেহ জন্মেছে। তাই অধ্যাপক Haas বলেছেন, "It is true that Europe is on the whole inhabited by Aryan peoples, but the same Aryans have produced quite a different culture in India." বোধহয় এই কারণে যে, ভারতবর্ষের জলবায়ুর দোষে তাদের রক্তের নীল রঙ ঝল্‌সে গিয়েছে, ও লাল গোলাপী হয়েছে।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল ক্ষেত্রও নয়, বীজও নয়।

৬

য়ুরোপ বলতে লোকে যা বোঝে, তার মর্ম্ম য়ুরোপের মাটির অন্তরেও পাওয়া যাবে না, য়ুরোপীয়দের দেহের অন্তরেও পাওয়া যাবে না। কারণ, মানব-সভ্যতার সৃষ্টি জিওগ্রাফি করে না, করে হিষ্টরি; মানুষের দেহ করে না, করে তার মন। এই কারণে "It is only as a spiritual and cultural entity that Europe can have a meaning for us"। এর পরই অধ্যাপক মহাশয় প্রশ্ন করেছেন—"Europe, its spirit, its civilisation, is something unique," এ হেন কথা কি সত্য ?

তিনি বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকরা, যথা Voltaire, Rousseau প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীময় মানুষের একই চরিত্র,

এবং Pekin থেকে Paris পর্য্যন্ত মানুষমাত্রই এক গোত্রজ। আর সে গোত্রের নাম মানবগোত্র। এ মত যাঁরা মেনে নিয়েছেন, তাঁদের মতে য়ুরোপীয় সভ্যতার কোনও বিশেষত্ব নেই। কিন্তু আজকের দিনে "Biology teaches us that every kind of living organism has a world of its own." অর্থাৎ মানুষমাত্রেই এক জগতে বাস করে না, কেউ করে ব্রহ্মার সৃষ্ট পৃথিবীতে, কেউ বা আবার বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতে। অতএব মানুষে মানুষে কতক অংশে মিল থাকলেও, অনেক অংশে প্রভেদ আছে। আর এই ভেদজ্ঞানটুকু উপেক্ষা ক'রে সাধারণ মানবচরিত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়। আর আমরা যাকে মানব-সভ্যতা বলি, তা কোন একটি বিশেষ জাতির মানসিক বিশিষ্টতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানব ব'লে কোন এক শ্রেণীর জন্তু নেই।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে "what is the specifically European element"—এরই অনুসন্ধান করতে হবে; এবং তার সন্ধান আমরা পাব, যদি আমরা ধরতে পারি "what is common to their culture, despite all national differences, without its being a characteristic of mankind in general," সংক্ষেপে, কোন্ গুণে সকল য়ুরোপীয় এক, এবং অন্-য়ুরোপীয়দের সঙ্গে পৃথক, তাই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য। এখন এ জিজ্ঞাসার মীমাংসা শোনা যাক্।

৭

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল যদি য়ুরোপ নামক দেশের অন্তরেও না পাওয়া যায়, য়ুরোপীয় মানবের দেহের অন্তরেও না পাওয়া যায়, তাহ'লে সে মূল

কোথায় নিহিত ? অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে, এ সভ্যতা য়ুরোপীয় spirit থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ইংরাজী ভাষায় যাকে spirit বলে, তার বাঙলা কি সংস্কৃত প্রতিবাক্য আমি জানিনে। কারণ, আত্মা ও spirit পর্য্যায়শব্দ নয়। Spiritকে আত্মা বলা বোধহয় ঠিক নয়, "অহং" বলাই উচিত। কারণ, "অহং" জিনিষটে ভেদবুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ প্রবন্ধে আমি European spiritকে য়ুরোপীয় আত্মা বলব ; কিন্তু সে আত্মাকে "অহং" অর্থেই বুঝতে হবে।

য়ুরোপীয় আত্মার বিশিষ্টতা যে কি, তার পরিচয় নিতে হবে, উক্ত আত্মার আত্মপ্রকাশ থেকে।

এখন এ সত্যটি যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি স্পষ্ট যে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা হচ্ছে technical civilization অর্থাৎ technical scienceএর উপর প্রতিষ্ঠিত। এ হচ্ছে আসলে ব্যবহারিক সভ্যতা। প্রকৃতির যে মতিগতি science আবিষ্কার করেছে, সেই মতিগতিকে মানুষের ঘরকন্নার কাযে নিয়োগ করা, এক কথায় প্রকৃতিকে মানুষের সেবাদাসীতে পরিণত করাই য়ুরোপীয়দের চরম কৃতিত্ব।

কিন্তু কোন নায়িকাকে বশ করা যে কেবলমাত্র কামনা-সাপেক্ষ নয়, এ কথা সেকেলে তান্ত্রিকরাও জানতেন। বশীকরণের পিছনে মন্ত্র থাকা চাই। প্রকৃতির বশীকরণের মন্ত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এ মন্ত্র লাভ করা সাধনাসাপেক্ষ। য়ুরোপীয় আত্মা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। বিজ্ঞানের কঠোর সাধনার ফলে য়ুরোপীয়রা সমগ্র অনাত্ম জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু য়ুরোপীয়রা প্রকৃতিকে দাসীগিরি করাবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা করে নি,

করেছিল শুধু তাকে প্রকৃষ্টরূপে জানবার জন্য। এ শাস্ত্রের প্রথম সূত্র হচ্ছে "অথাতো প্রকৃতিজিজ্ঞাসা"। জ্ঞানই তাদের মুখ্য বস্তু ছিল, কর্ম্ম তার ফল মাত্র। বিজ্ঞানের আচার্য্যেরা কর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এবং তা ছিলেন বলেই এ বিদ্যা তাঁরা আয়ত্ত করতে পেরেছেন। কথা সত্য এবং আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক মহাশয় যদি ফলনিরপেক্ষ হয়ে য়ুরোপ-সভ্যতা বস্তু কি জিজ্ঞাসা করতেন, তা হ'লে তিনিও তার সন্ধান পেতেন।

৮

তিনি বলেন যে, এই সূত্রেই আমরা য়ুরোপীয় আত্মার বিশেষত্বের সন্ধান পাই। য়ুরোপীয় আত্মার ধর্ম্মই এই যে—"to organise everything with which it has to deal, to mould everything whether it be material or spiritual, in such a way that it constitutes a unity in multiplicity।" অর্থাৎ বহুকে এক ক'রে দেখবার এবং বহুকে এক সূত্রে গাঁথবার শক্তি। এক কথায়, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে organise করবার প্রবৃত্তি ও শক্তিই হচ্ছে য়ুরোপীয় আত্মার বিশেষত্ব। Kepler আবিষ্কার করেছিলেন যে, "wherever there was matter, there was geometry।" তারপর Galileo আবিষ্কার করেন যে, "the book of nature is written in the language of mathematics;" এবং এ দুটি কথাই হচ্ছে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। এবং এই মন্ত্রের সাধনা করেই য়ুরোপ জড় প্রকৃতির উপর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছে।

কিন্তু প্রকৃতিকে জানবার এবং বাগ মানাবার প্রবৃত্তি সার্থক হয়েছে এই জন্য যে, কি উপায়ে তাকে জানা যায়, সে পদ্ধতি গ্রীকরা উদ্ভাবন করে; তারপর কি উপায়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায়, তার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে রোমানরা। তারপর মধ্যযুগে য়ুরোপীয়েরা পরলোক জয় করবার জন্য যে আত্মশক্তি সঞ্চয় করে, সেই শক্তিই এ যুগে তারা ইহলোক জয় করবার কার্য্যে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ গ্রীকদের জ্ঞান, রোমানদের কর্ম্ম, এবং মধ্যযুগের ভক্তি, এই তিনে মিলেমিশে বর্ত্তমান technical civilisationএর সৃষ্টি করেছে। অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতাকে একটি ভগবদ্গীতা বলা যায়। কারণ, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমন্বয়ে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে ; এবং বর্ত্তমানে য়ুরোপের পক্ককষায় মন থেকেই technical civilisation উদ্ভূত হয়েছে। এই হচ্ছে য়ুরোপীয় আত্মার চরম পরিণতি। এই কথাটা বুঝতে পারলেই য়ুরোপের জাতিসমূহ ভবিষ্যতে আর পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করবে না। একেই বলে জ্ঞানে মুক্তি। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, তবে প্রলয়ের আশঙ্কার কারণ কি ?

৯

এখন এ বিষয়ে একটি ফরাসী লেখকের মতামত শোনা যাক। (Nation et Civilisation, par Lucien Romier). Lucien Romier বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের আচার্য্য নন, তিনি এক জন প্রবন্ধলেখক সাহিত্যিক মাত্র ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জর্ম্মাণ অধ্যাপকের কথার অপেক্ষা, ফরাসী সাহিত্যিকের কথা ঢের বেশী সহজবোধ্য। জড়ানো হাতের লেখার সঙ্গে ছাপার অক্ষরের যে প্রভেদ, জর্ম্মাণ পাণ্ডিত্যের রচনার সঙ্গে

ফরাসী সাহিত্যের রচনার সচরাচর সেই একই প্রভেদ দেখা যায়। সুতরাং য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি, সে বিষয়ে ফরাসী মত সত্য হোক, মিথ্যা হোক, জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতের চাইতে অনেক সুবোধ ; এবং সম্ভবতঃ সুবোধ বলেই Romier-র Nation et Civilisation, ইংলণ্ডের যে সম্প্রদায় লেখাপড়ার কারবার করেন, সে সম্প্রদায়ের মনকে বেশী ক'রে স্পর্শ করেছে।

Romier প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন,—qu'est-ce quel' Europe? অর্থাৎ য়ুরোপ বস্তু কি? তিনি বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, আজকের দিনে বিশ্বমানবের কাছে য়ুরোপের নামডাক অসম্ভব-রকম বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং য়ুরোপ বল্‌তে কি বোঝায়, তা বুঝতে হ'লে, য়ুরোপের জিওগ্রাফির এবং ইকনমির্ক অবস্থার জ্ঞানই যথেষ্ট নয়,—উপরন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রধান গুণগুলি হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে হবে।

অবশ্য য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত কর্‌তে হ'লে, য়ুরোপ নামক ভূভাগ ও তার অধিবাসীদের raceএর উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, য়ুরোপ নামক দেশটা যে তার অধিবাসীদের অনেক পরিমাণে গ'ড়ে তুলেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধনী হবার, শক্তিমান হবার যতটা সুযোগ য়ুরোপের অধিবাসীরা তাদের দেশের কাছ থেকে পেয়েছে, পৃথিবীর অন্য জাতিরা ততটা পায়নি ; য়ুরোপের সৌভাগ্য যে কতক অংশে প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা অস্বীকার করা মূর্খতা।

(১০)

কিন্তু য়ুরোপের material civilisation য়ুরোপের যথার্থ civilisation নয়। যাঁরা মনে করেন, য়ুরোপের ঐশ্বর্য্যই তার সভ্যতার চরম ফল

তাঁদের বলা দরকার যে, যদিও তাই হয়, তাহ'লে ভবিষ্যতে তাঁদের ঐশ্বর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। অতীতে যে-সব কারণে ও উপকরণের সাহায্যে য়ুরোপ তার বর্ত্তমান ধন-দৌলত লাভ করেছে, সে সব কারণ যে ভবিষ্যতেও তার সহায় হবে, এরূপ আশা করা বৃথা।

একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই তাদের নিজের নিজের দেশকে exploit করতে শিখেছে, এবং কর্‌ছে, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে য়ুরোপের মত সমান কৃতকার্য্য হবে। অর্থাৎ material civilisation-এ য়ুরোপ অপর সকল দেশের উপর চিরকাল টেক্কা দিতে পার্‌বে না। যাকে বলে technical বিদ্যা, তা বিশ্বমানবের করায়ত্ত হয়েছে। সুতরাং technical civilisationই যদি European civilisation হয়, তাহ'লে সে civilisation-এর য়ুরোপীয় নামের কোনও সার্থকতা থাক্‌বে না।

সত্য কথা এই যে, য়ুরোপকে সৃষ্টি করেছে প্রধানতঃ হিষ্টরি—জিওগ্রাফি নয়; অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক নয়—আর তার ভিত্তি হচ্ছে একটি বিশেষ "moral and intellectual tradition". সেই ভিত্তির উপরই য়ুরোপীয় সভ্যতার ইমারত গ'ড়ে উঠেছে, এবং সেই ভিত আল্‌গা হ'লেই য়ুরোপীয় সভ্যতা ভেঙে পড়বে। এই ভিত্তির গোড়া আল্‌গা হয়েছে বলেই য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়েছিল। সুতরাং য়ুরোপীয় সভ্যতা যাঁরা রক্ষা করতে চান, তাঁদের জানা উচিত—য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি? কারণ য়ুরোপে তথাকথিত material civilisation যাঁরা যথার্থ civilisation ব'লে ভুল করেন, তাঁরাই য়ুরোপীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে

যাচ্ছেন। বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব যথার্থ সভ্যতার ফল মাত্র—তার মূল নয়।

(১১)

গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম্ম—এই তিনে মিলে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতাকে গ'ড়ে তুলেছে।

গ্রীকজাতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিপত্তন ক'রে গিয়েছেন। রোমানজাতি সমাজরক্ষা ও রাজ্যশাসনের নিয়ম বিধিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রেয়র চাইতে শ্রেয়র মাহাত্ম্য যুগ যুগ ধ'রে প্রচার করেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের idealism, গ্রীক realism, ও রোমান legalism-এর মিলনের ফলে য়ুরোপীয় মানব তার গৌরব লাভ করেছে।

কিন্তু Renaissance-এর যুগ হতেই গ্রীক বিজ্ঞান, খৃষ্ট নীতি, ও রোমান রাজনীতি পরস্পর পৃথক্ হ'তে সুরু করে। ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতার balance ভঙ্গ হয়। Balance যে ভঙ্গ হয়েছে, এ সত্য অনেক দিন আমাদের কাছে ধরা পড়েনি। শেষটা পলিটিকাল materialism যখন য়ুরোপের লোকের মনকে গ্রাস করলে, তখন গ্রীক বুদ্ধি এবং খৃষ্ট ধর্ম্মনীতি মানুষের মন থেকে খসে পড়ল। ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতার এখন এই দুর্দ্দশা ঘটেছে। অর্থাৎ তার বাহ্য ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু ভিতরটা ফোঁপ্‌রা হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর অপরাপর জাতির কাছে য়ুরোপীয়েরা এখন আর একটা বড় সভ্যতার প্রতিনিধি বলে মান্য নয়। এ যুগে তারা চতুর বণিক অথবা

নিপুণ শিল্পী বলেই গণ্য। তারা আজকের দিনে স্বার্থসাধন করতে অতিশয় পটু ; কিন্তু এ নিপুণতা, এ পটুতার অন্তরে কোনরূপ বিশেষ সভ্য মনোভাব নেই। কারণ, এ জাতীয় কর্ম্মকৌশল পৃথিবীর অপর সকল জাতিই আত্মসাৎ করতে পারে, সেই সঙ্গে য়ুরোপের nationalism, industrialism-এর ধর্ম্মেও অনুপ্রাণিত হ'তে পারে। আর যখন পলিটিকাল nationalism এবং industrialism-এর মূলমন্ত্র হচ্ছে অপর জাতির সঙ্গে বিরোধ, তখন যে-সব জাতিকে য়ুরোপ এই নব মন্ত্রে দীক্ষিত করবে, এবং সে মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার যন্ত্রপাতিও তাদের দেবে, সে সব জাতি য়ুরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত হবে। এই হচ্ছে য়ুরোপের তথাকথিত নব সভ্যতার কর্ম্মফল।

(১২)

এখন দেখা গেল যে, জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ও ফরাসী সাহিত্যিক উভয়েই মনে করেন যে, সম্মুখে মস্ত বিপদ আছে—অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতা এখন টলমল করছে। তারপর য়ুরোপীয় সভ্যতা যে গ্রীক জ্ঞান, রোমান রাজনীতি ও খৃষ্টধর্ম্ম, এ তিনের সমবায়ে গ'ড়ে উঠেছে,—এবিষয়েও উভয়েই একমত। শুধু বর্ত্তমান সভ্যতার রূপগুণ সম্বন্ধে তাঁদের মতে মেলে না।

জর্ম্মাণ অধ্যাপকের মতে technical civilisation হচ্ছে য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম পরিণতি ; ফরাসী লেখকের মতে কিন্তু তা অবনতি। কারণ, সভ্যতার যা প্রাণ—অর্থাৎ intellectual and moral tradition—বর্ত্তমান য়ুরোপ তার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এখন য়ুরোপে রোমান রাজনীতিই প্রভুত্ব করছে। বিশ্বমানবের উপর প্রভুত্ব করাই এ যুগে

য়ুরোপের একমাত্র মনোভাব। এ মনোভাব সভ্য মনোভাব নয়, এবং এই মনোভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি বলেই রোমান সভ্যতা ধূলিসাৎ হয়েছে।

জাতিতে জাতিতে যে মনের ও চরিত্রের প্রভেদ আছে, সে কথা ফরাসী লেখকও মানেন, এবং স্বধর্ম্মপালন করেই জাতি যে সভ্য হয়ে উঠতে পারে, এই তাঁর দৃঢ় ধারণা; সুতরাং তিনিও nationalism-এর মহাভক্ত; কিন্তু যে nationalism অপর nationalism-এর হন্তারক, সে nationalism-কে তিনি political nationalism বলেন। কারণ, এ nationalism intellect ও morals-এর ধার ধারে না; অতএব হিংস্র হতে বাধ্য।

এখন য়ুরোপীয় সভ্যতা কি ক'রে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে? ফরাসী লেখক বলেন যে, য়ুরোপের মনে আবার কেউ যদি ধর্ম্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তাহলেই য়ুরোপীয় সভ্যতা রক্ষা পায়;—কিন্তু তা করবে কে?

জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতে, যদিও য়ুরোপীয় সভ্যতা তার চরমপদ লাভ করেছে—তবুও তার আরও উন্নতির অবসর আছে। এ বিষয়ে তাঁর শেষ কথা ক'টি উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছিঃ—

"If it is true that it has passed through all spheres of being and accomplished all tasks, it will begin the cycle a second time, and enriched by the experience and success of the first cycle, will be able to attain new heights. Perhaps the time is not far off when, following

the example of the Greeks, it will once more find its chief aim in the shaping of man. Let us hope so. For it has become very necessary."

আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষ তৈরি করা কি সভ্যতার শেষ কথা না প্রথম কথা ? আগে মানব-সভ্যতা গ'ড়ে তারপর মানুষ গড়া, গাড়ীর লেজে ঘোড়া জোতার মত বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয় কি ?

(১৩)

য়ুরোপীয় সভ্যতা যে কালে ভেঙ্গে পড়বে, এ ভয় আমরা পাইনে। কারণ, যে গুণে য়ুরোপ সভ্য, সে গুণের ধ্বংস নেই। জর্ম্মাণ অধ্যাপক ও ফরাসী সাহিত্যিক উভয়ের মতেই পুরাকালের গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান, রোমের কল্পিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও মধ্যযুগের ধর্ম্মমনোভাবই য়ুরোপীয় সভ্যতার মাল-মশলা। এক কথায়, য়ুরোপীয়দের মনই তাদের সভ্যতা গড়েছে।

গ্রীক সভ্যতা অনেক কাল হ'ল ভেঙ্গেচূরে গিয়েছে, কিন্তু গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সাহিত্য আজও মানুষকে সভ্য করছে।

রোমের সাম্রাজ্য সেকালে য়ুরোপের অসভ্য জাতিদের এক ধাক্কায় সমূলে বিনষ্ট হয়েছিল ; কিন্তু আজও সমগ্র সভ্য জগৎ রোমের বিধিনিষেধ শাস্ত্র মেনেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে।

মধ্যযুগের ধর্ম্মপ্রাণ সভ্যতার বিষয় আমরা বেশি কিছু জানিনে, সুতরাং জর্ম্মাণ ও ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের কথা মেনে নিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। মধ্যযুগের সভ্যতা জ্ঞানকর্ম্মহীন ছিল। একমাত্র ভক্তির উপর কোন সভ্যতাই চির-প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। ফলে

য়ুরোপ যখন গ্রীক সাহিত্যের ও রোমান রাজনীতির সন্ধান পেলে, তখন মধ্যযুগের সভ্যতার অবসান হ'ল; যেমন এ যুগে আমরা য়ুরোপের জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের সন্ধান পেয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত ভক্তিমার্গ ত্যাগ করেছি। তবে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, য়ুরোপীয় মানবের ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান মধ্যযুগের সৃষ্ট। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। য়ুরোপের নব ধর্ম্ম ডিমোক্রাসির মূল গ্রীকদর্শন নয়, নব বিজ্ঞানও নয়। যে মনোভাবের উপর ডিমোক্রাসি প্রতিষ্ঠিত, সে মনোভাবের স্রষ্টা হচ্ছেন যিশুখৃষ্ট।

এর থেকে দেখা যায় যে, কোন জাতিবিশেষ যে অংশে সভ্য, সে অংশে অমর। শুধু তাই নয়, যে-ই সত্যের সন্ধান পাক্ না কেন, সে সত্য সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। গ্রীক জাতি মারা গেল, কিন্তু তার দর্শনবিজ্ঞান সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হ'ল বিশ্বমানব। রোমান জাতি বিনষ্ট হ'ল, কিন্তু য়ুরোপের তির্য্যক্-সামান্য অসভ্য জাতিরা মধ্যযুগের সভ্যতা গ'ড়ে তুল্লে, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাহায্যে। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিদ্যা (theology) গড়ে উঠেছে আরিষ্টটলের দর্শনের ভিত্তির উপর; এবং তার খৃষ্টসঙ্ঘ (church) গ'ড়ে উঠেছে রোমান রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুকরণে।

(১৪)

সভ্যতা বলতে অধিকাংশ লোকে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আর্ট বোঝে না—বোঝে অর্থ ও স্বার্থ; এবং তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও নয়। অর্থ ও কাম, প্রবৃত্তিরেষা নরাণাম্। এবং যে সমাজে মানুষের এ দুটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হয়, সে সমাজ কখনই চিরস্থায়ী হ'তে পারে না।

যাকে আমরা material civilisation বলি, সে বস্তু হচ্ছে সকল সভ্যতার যুগপৎ আধার ও ফল। না খেয়ে পরে' মানুষ যে বাঁচতে পারে না—এ কথা কে না জানে ? আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাও উপবাসী হয়ে হিন্দু সভ্যতা গড়তে পারেন নি। এ হিসাবে য়ুরোপের বর্ত্তমান material civilisation অবজ্ঞার বস্তু নয়।

সংস্কৃতে একটি বচন আছে, যা সর্ব্বলোকবিদিত—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" এই অর্থগত সভ্যতা গড়বার বিদ্যা গ্রীসেরও জানা ছিল না, রোমেরও জানা ছিল না। উভয় জাতিই পরস্ব অপহরণ করেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখতেন। গ্রীক সভ্যতা দাঁড়িয়ে ছিল দাসের কর্ম্মশক্তির উপর ; আর রোমক সভ্যতা অপর দেশ লুঠতরাজের উপর। ফলে উভয় সভ্যতারই ভিত নেহাৎ কাঁচাই ছিল।

বর্ত্তমান য়ুরোপ, যে বিদ্যার বলে মানুষে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে, সে বিদ্যা অর্জ্জন করেছে। এ হিসাবে Scienceকেই য়ুরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু গ্রীক দর্শন ও রোমান আইন যেমন দুই সভ্যতার একচেটে জিনিষ নয়—বিশ্বমানবের সম্পত্তি ; তেমনি modern scienceও বর্ত্তমান য়ুরোপের একচেটে জিনিষ নয়। এ বিদ্যা বিশ্বমানব শিখবে, এবং ফলিত বিজ্ঞানও বিশ্বমানবের করায়ত্ত হবে। ফলে এ বিষয়েও য়ুরোপের বর্ত্তমান প্রাধান্য আর থাক্‌বে না। য়ুরোপীয় অর্থে, এসিয়াও সভ্য হবে। এর জন্য য়ুরোপের ভয় পাবার কোনও দরকার নেই। কোনও সভ্যসমাজকে কোনও সভ্যসমাজ বিনাশ করেনি। সভ্যতার প্রধান শত্রু যে অসভ্যতা, য়ুরোপ ও এসিয়ার ইতিহাসের পাতায় পাতায় তা লেখা আছে।

এ তো গেল বহিঃশত্রুর কথা। এ ছাড়া ধ্বংসের মূল জাতির অন্তরেও থাকে। য়ুরোপের material civilisationএর মূলে যদি এই মনোভাব থাকে যে, য়ুরোপীয়েরা পরের খাটুনির ফল ভোগ করবে আর পরের দেশ লুঠে খাবে; তাহ'লে অবশ্য গ্রীস-রোমের মতই তার ধ্বংস অনিবার্য্য। এ অবস্থায় "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"—আদেশ মান্‌লে তবেই তার ফাঁড়া কেটে যাবে।

কারণ, ধর্ম্ম আচরণের গুণ এই যে, তাতে লোকের অহংবুদ্ধি খর্ব্ব করে। যে তিন পূর্ব্ব-সভ্যতা য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে, সে তিনই ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে সে তিন cultureই য়ুরোপের অহং-জ্ঞানকে পরিস্ফুট করেছে। এ বিষয়ে জনৈক আমেরিকান সাহিত্যিকের কথা নিম্নে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার spirit হচ্ছে অহঙ্কার:—

"There is the pride of culture, like that of the ancient Greeks; our word "barbarian", from their term for all aliens, still expresses the feeling.

There is the pride of religion, remnant of the mediæval perversion of Christianity, which transformed acceptance of the most inclusively loving and humble teacher earth has known, into a ground for arrogance. The tone in which "pagan" and "heathen" are often pronounced, tells the story.

There is the pride of political efficiency, inherited

perhaps from Rome, causing us to despise those unpossessed of organised power.

Last to grow, perhaps, is the pride of scientific and mechanical achievement—that which impels a Westerner to identify sanitary plumbing and speedy communication with civilisation.

এই মনের পাপই য়ুরোপের প্রধান শত্রু; এবং Hass প্রমুখ পণ্ডিতরা এ পাপের প্রশ্রয় আজও দিচ্ছেন।

১লা আষাঢ়, ১৩৩৭। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ভারতবর্ষ সভ্য কিনা ?

সেকালে ভারতবর্ষ ছিল মীমাংসার যুগ, একালে হয়েছে সমস্যার।

এ কথা যে সত্য, এতগুলো কমিশনই তার প্রমাণ। এই আজকের দিনে পাঁচ পাঁচটা কমিশনের প্রসাদে পাঁচ পাঁচটা সমস্যা রাজ-দরবারে টাঙানো রয়েছে; যথা—(১) চাকরীর সমস্যা (২) স্বরাজের সমস্যা (৩) অরাজকতার সমস্যা (৪) শিল্পের সমস্যা (৫) শিক্ষার সমস্যা; তার উপর আবার এসে জুটেছে বিয়ের সমস্যা।

এর পর জন্মমৃত্যু বাদে দুনিয়ার আর কোন্ সমস্যা বাকী রইল? ও-দুটির যে কোনও সমস্যা নেই, তার কারণ ও-দু'টিই হচ্ছে রহস্য। তবে এদেশে জন্মটা বড় রহস্য না মৃত্যুটা বড়, এ বিষয়ে একটা তর্ক অবশ্য

উঠতে পারে; কিন্তু ওঠে না এই জন্য যে, তার মামাংসাও স্পষ্ট। আমাদের পক্ষে ও দু'-ই সমান।

এ যুগ সমস্যার যুগ বিশেষ করে' এই কারণে যে, এ যুগে অধিকারী-ভেদ নেই। জীবন,—তা সে ব্যক্তিগতই হোক আর জাতিগতই হোক,—চিরকালই একটা সমস্যা, কিন্তু সেকালে এ সমস্যা নিয়ে মাথা বকাত দু'চারজন; আর একালে কোনও বিষয়ে একটা সমস্যা উঠলে আমরা সকলে মিলে তার মীমাংসা করতে বাধ্য। যেকালে সকলের সকল বিষয়ে মত দেবার অধিকার আছে, সেকালে কোন বিষয়েই কারও চুপ করে থাকবার অধিকার নেই। যদি বল, যার নিজের একটা মত গড়বার সামর্থ্য নেই,—এক কথায় যার মত বলে' কোনও পদার্থ ই নেই—সে সে-পদার্থ দান করে কি করে'?—তার উত্তর, মনের ঘরে যার শূন্য আছে, সে শূন্যই দিতে পারে; শুধু যে দিতে পারে তাই নয়, দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য তার পক্ষে তা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। একের পিছনে শূন্য বসালে তা দশগুণ বেড়ে যায়, এ কথা কে না জানে? সুতরাং যার হোক একটা মতের পিছনে আমরা যদি ক্রমান্বয়ে শূন্য বসিয়ে যাই, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে তার দশগুণ করে' মূল্য বেড়ে যাবে।

সত্য কথা বলতে গেলে, রাজনৈতিকপ্রমুখ বিষয়ে অধিকাংশ লোকের পক্ষে কোনরূপ মত না থাকাটাই শ্রেয়। সকলেরই যদি একটা-না-একটা স্বমত থাকে, তাহ'লে নানা মতের সৃষ্টি হয়; অপর পক্ষে অধিকাংশ লোক মতশূন্য হলে যা সৃষ্টি হয়, তার নাম লোকমত। আর এ কথা বলা বাহুল্য যে, একালে লোকমতই হচ্ছে একমাত্র কেজো মত, কেননা ও-মতের অভাবে হয় কোন বিলই পাস হয় না, নয় সকল বিলই পাস হয়।

এর কারণও খুঁজে বার করতে হবে না। নানা মত পরস্পরের সঙ্গে কাটাকাটি গিয়ে বাকী থাকে শুধু শূন্য, আর শূন্যে শূন্যে যোগ দিলে দাঁড়ায় গিয়ে বিরাট একে। এই সত্যই যে সার সত্য, তার প্রমাণ দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক, দু'রকম অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমান পাওয়া যায়।

(২)

উপরে যে-সব সমস্যার ফর্দ্দ দেওয়া গেছে, তার উপর সম্প্রতি আর একটি সমস্যা এসে জুটেছে, যার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তার কোনও মীমাংসা নেই—অথচ অনেক তর্ক আছে।

সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, "ভারতবর্ষ সভ্য কিনা"? দেখতে পাচ্ছেন সমস্যাটা কত ঘোরতর, কত গুরুতর! এ সমস্যা অবশ্য রাজনৈতিকও নয়, সামাজিকও নয়,—কিন্তু সকলপ্রকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা ওরই অন্তর্ভূত।

যদি জিজ্ঞাসা করেন—যার মীমাংসা নেই, এমন সমস্যা ওঠে কেন? তার উত্তর—একজনে এর পূর্ব্ব-মীমাংসা করে দিয়েছেন বলেই, আর পাঁচজনে তার উত্তর-মীমাংসা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে একটা বিষম তর্কে।

William Archer নামক জনৈক ধনুর্ধর ইংরাজি লেখক এবং প্রবীণ ভাবুক, ভারতের নানা দেশ পর্য্যটন করে' অবশেষে উপনীত হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে যে—

"ভারতবাসীরা হচ্ছে অসভ্য জাতিদের মধ্যে সব চাইতে সভ্য এবং সভ্য

জাতিদের মধ্যে সব চাইতে অসভ্য"। অমনি আমরা অস্থির হ'য়ে উঠেছি।

এ কথায় কিন্তু বিচলিত হবার কোনও কারণ আমি দেখতে পাইনে। William Archer-এর মত যদি সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? আমরা যদি সভ্যতার মধ্যপথ অবলম্বন করে' থাকি, তাহ'লে ত আমরা আরিষ্টটলের মতে ঠিক পথই ধরেছি, বৌদ্ধ মতেও তাই। আর সেকেলে দর্শন যদি বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে বলি হেগেলের মতেও দাঁড়ায় এই যে, সভ্যতা (thesis) + অসভ্যতা (antithesis) = সভ্যাসভ্যতা (synthesis). অর্থাৎ আমাদের সভ্যাসভ্যতাটা হচ্ছে synthetic civilisation, অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বেশি অসভ্য হওয়া যে ভাল নয়, সে ত পুরানো সত্য; আর বেশি সভ্য হওয়াও যে মারাত্মক, এই নতুন সত্য ত ইউরোপে হাতে হাতে প্রমাণ হ'য়ে গেল। এক দিকে সভ্যতা আর এক দিকে অসভ্যতা, এই দুই চাপের ভিতর পড়াটা অবশ্য সুখের অবস্থা নয়; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে সুখের অবস্থা, এমন কথা আর যেই বলুক, আমরা ত কখনো বলিনে।

আর এক কথা, কি সভ্যতা কি অসভ্যতা এ দু'য়ের কোনটিরই ভিতর মানুষের শান্তি নেই,—না দেহের না মনের। যারা নিজেদের অসভ্য বলে জানে, তারা সভ্য হবার জন্য লালায়িত হয়; আর যারা নিজেদের সভ্য বলে জানে, তারা স্বাভাবিক হবার জন্য লালায়িত হয়। পুরাকালে ভারতবর্ষ যখন অতি সভ্য হ'ল, তখন ভারতবাসী সভ্যতার শিক্‌লি কেটে বনে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল; এবং একই অবস্থায় একই কারণে, গ্রীক্‌রা হলো ফিলজফার আর রোমানরা খৃষ্টান। তারপর

যখন নব রোমক-খৃষ্টান-সভ্যতা পূরোপূরি গড়ে উঠল, তখন রুসো সকলকে পরামর্শ দিলেন আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে—অমনি দেশসুদ্ধ লোক মেতে উঠল। অপরপক্ষে যাদের জ্ঞান তারা অসভ্য, তারা যে সভ্য হবার জন্য আঁকুবাঁকু করে, তার প্রমাণ কি আর উদাহরণের অপেক্ষা রাখে?—অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, শান্তি যদি কোথায়ও থাকে ত সভ্যতা আর অসভ্যতার মিলনক্ষেত্রে; কেননা ও-ক্ষেত্রে অসভ্যতা সভ্যতার, এবং সভ্যতা অসভ্যতার তেজ বিলকুল ও বেমালুম মেরে দেয়। সুতরাং একাধারে সভ্য এবং অসভ্য হওয়াটাই বুদ্ধিমান জাতের কাজ; আর আমাদের মাথায় যে মগজ নেই, এমন কথা William Archer-ও বলেন না।

আমার এ সব কথা যতই যুক্তিযুক্ত হোক না কেন, আমার মত কেউ গ্রাহ্য করবেন না। কেননা একদল প্রমাণ করতে যেমন ব্যস্ত যে, আমরা অতি সভ্য,—আর একদল প্রমাণ করতে তেমনি ব্যস্ত যে, আমরা অতি অসভ্য। সুতরাং এ দুই দলকে কেউ ঠেকাতে পারবে না; তাঁরা তর্ক করবেনই, শুধু William Archer-এর সঙ্গে নয়, পরস্পরের সঙ্গেও।

এ উভয়কেই আমি বলি স্থিরোভব। আমরা যে অসভ্য, এ প্রমাণ করবারই বা সার্থকতা কি? আর আমরা যে সভ্য, এ প্রমাণ করবারই বা সার্থকতা কি? কেউ যদি প্রমাণ করে' দেয় যে আমরা অসভ্য, তাহ'লেই কি আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে, না আমাদের জীবনের সকল সমস্যা উড়ে যাবে?—তা অবশ্য কখনই হবে না, উপরন্তু আর একটা সমস্যা বাড়বে,—সে হচ্ছে সভ্য হবার মহা সমস্যা।

অপরপক্ষে আমরা যদি প্রমাণ করে দিই যে আমরা সভ্য, তাহ'লেই কি আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, না আমাদের জীবনের সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে?—তা অবশ্য কখনই হবে না, কেননা নিজের সার্টিফিকেট নিজের কোনও কাজে লাগে না, ব্যক্তির পক্ষেও নয় জাতির পক্ষেও নয়। তা ছাড়া নিজের দরখাস্তের বলে, এ ক্ষেত্রে পরের কাছ থেকে ভাল সার্টিফিকেট আমরা কিছুতেই আদায় করতে পারব না। সভ্যতা সম্বন্ধে প্রতি জাত নিজেকে "সোঽহং" মনে করে, কিন্তু অপর কোনও জাতকে "তত্ত্বমসি" বলতে প্রস্তুত নয়। তবে প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে এ কথা অবশ্য খাটে না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান-সভ্যতার সুখ্যাতি যে ইউরোপের মুখে আর ধরে না, এ কথা কে না জানে? তার কারণ এই যে, যে-সভ্যতা মরে ভূত হয়ে গেছে, উঁচুগলায় তার গুণগান করবার ভিতর কোনও বিপদ নেই; কেননা কোন জ্যান্ত সভ্যতার উপর ও-সব মরা সভ্যতার কোনও দাবী নেই। প্রাচীন ও মৃত সভ্যতা কোনও বর্ত্তমান সভ্যতার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতা তার কাছ থেকে ঢের আদায় করে, এবং তার নুন খায় বলেই তার গুণ গায়। ভারতবর্ষের সভ্যতা গ্রীস-রোমের সভ্যতার মত প্রাচীন হলেও, প্রশস্য নয়—কেননা তা মৃত নয়, জীবিত। এ সভ্যতার অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে, তা আজও বেঁচে আছে, এবং বহুকাল বেঁচে আছে বলে আরও বহুকাল বেঁচে থাকতে চায়, তাই তার দাবীর আর অন্ত নেই। এ সভ্যতার সপক্ষে ইউরোপের সার্টিফিকেট বার করা অসম্ভব। আর যদিই বা করা যায়, তাতেই বা কি লাভ? আমাদের জাতীয় সমস্যার আশু মীমাংসা ততটা

নির্ভর করবে না আমাদের প্রাচীন সভ্যতা কিম্বা অসভ্যতার উপর, যতটা নির্ভর করবে ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা কিম্বা অসভ্যতার উপর।

যদি কেউ বলেন যে, ইউরোপের খাতিরে নয়, সত্যের খাতিরে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, ভারতবর্ষ সভ্য। তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ও চেষ্টায় উল্টো উৎপত্তি হবারই সম্ভাবনা বেশি। মানুষ যেমন মুখের জোরে নিজেকে অপরের চাইতে বেশি ভদ্র প্রমাণ করতে গিয়ে শুধু অভদ্রতারই পরিচয় দেয়, জাতিও তেমনি নিজেকে অপরের চাইতে বেশি সভ্য প্রমাণ করতে গিয়ে শুধু অসভ্যতারই পরিচয় দেয়। এর প্রথম কারণ, সভ্যতা প্রমাণ করতে হয় হাতে কলমে, কাগজে কলমে নয়,—কেননা ও-বস্তু আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তির বলে নয়, কর্ম্মের ফলে। এর দ্বিতীয় কারণ, মানুষ সভ্য হলেও মানুষই থাকে; সভ্য মানবেরও সত্তার মূলে রয়েছে আদিম মানব। সুতরাং মানুষ যখন অবিশ্বাসী লোকের সুমুখে নিজেকে সভ্য-মানব বলে খাড়া করতে যায়, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ও-ক্ষেত্রে যাকে খাড়া করা হয়, সে হচ্ছে আদিম মানব; কেননা এরকম কাজ মানুষে এক রাগের মাথায় ছাড়া আর কোন অবস্থায় করে না। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা থাকলে মানুষে যে এ কাজ করে না, তার কারণ ও-কাজ করা হয় অনাবশ্যক, নয় নিরর্থক। সভ্যতা বলে' যদি মানব-সমাজে কোনও এক বস্তু থাকে, তাহ'লে সভ্যসমাজ মাত্রেই তার সঙ্গে পরিচিত। যা প্রত্যক্ষ, তার অস্তিত্বের প্রমাণ অনাবশ্যক। আর অসভ্যের কাছে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কেননা কোনও প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা অসভ্যের কাছে সভ্যতাকে প্রত্যক্ষ করে' তোলা যাবে না।

মতান্তরে সভ্যতা এক বস্তু নয়, কিন্তু দেশভেদে ও কালভেদে সভ্যতা হরেক রকমের হয়ে থাকে ; সভ্যতার ভিতরও বিশিষ্টতা আছে, এবং সভ্যতায় আর সভ্যতায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে পার্থক্য এত বেশি যে, তাদের মিলন কস্মিনকালেও হবে না। এ মতের চরম বাণী হচ্ছে Kipling-এর এই কথা,—The East is East and the West is West, and never the twain shall meet। এ কথা দেশে-বিদেশে অনেকে বেদবাক্য বলে গ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু আমার কাছে বরাবর তা নিরর্থক প্রলাপ বলেই মনে হয়েছে, কেননা ও-কথার অর্থ আমি কখনও বুঝতে পারিনি। সম্প্রতি বৃটিশ-সভ্যতার একটি অগ্রগণ্য মুখপত্রে তার ব্যাখ্যা দেখে নিশ্চিন্ত হলুম। Spectator লিখেছেন, Kipling-এর ও-কথার সাদা অর্থ হচ্ছে—Black is black and white is white.

এ ব্যাখ্যা যে অতি বিশদ, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু সেই সঙ্গে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, Spectator বৃটিশ সভ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে, শুধু বৃটিশ অসভ্যতারই পরিচয় দিয়েছেন। এর পর নিজের সভ্যতার বিশিষ্টতার ব্যাখ্যান করতে সকলেরই ভয় পাওয়া উচিত।

কোনও সভ্যতার বিশিষ্টতার প্রতি বিশেষ করে নজর দেওয়াতেও বিপদ আছে। ও অবস্থায় বিশিষ্টতাকেই সভ্যতা বলে মানুষের সহজে ভুল হয়। অপর সমাজের সঙ্গে নিজের সমাজ যে অংশে বিভিন্ন, সেই অংশকেই নিজের সভ্যতার প্রধান অঙ্গ বলে' অহঙ্কার করবার লোভ যায়। শুধু তাই নয়, তখন সেই অঙ্গকেই যেন-তেন-প্রকারেণ রক্ষা

করবার জন্য মানুষ বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে ; আর তার ফলে যদি সমাজের সকল অঙ্গ পঙ্গু হ'য়ে যায়, তাতেও সমাজ তার নিজের গোঁ ছাড়েনা। উদাহরণ স্বরূপ, এই পাটেল বিলের বিপক্ষ দলের কথাই ধরা যাক না। এঁরা বলেন, জাতিভেদ-প্রথা যখন হিন্দু সমাজ ছাড়া অপর কোনও সভ্যসমাজে নেই, তখন হিন্দু-সভ্যতার ভিত্তিই হচ্ছে জাতিভেদ-প্রথা। অতএব হিন্দু-সভ্যতার বিশিষ্টতা অর্থাৎ জাতিভেদপ্রথা বজায় রাখতেই হবে, তার জন্য যদি হিন্দুজাতি ধূলাশায়ী হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এ কথা বলাও যা, আর Spectator-এর কথায় সায় দেওয়াও তাই। Spectator-এর এ মত শুধু একমাত্র বর্ণভেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ওরকম ঢেরা-সই দেওয়াতে, বর্ণধর্ম্ম-জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বর্ণ-জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না, ধর্ম্মজ্ঞানেরও নয়। জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু-সমাজের গোড়ার কথা হলেও, হিন্দু-সভ্যতার শেষ কথা নাও হতে পারে।

সভ্যতার অবশ্য নানা রূপ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, আছে ; কিন্তু তার ক্রিয়া এক, এবং সে ক্রিয়া হচ্ছে মানব-জীবনের মুখ্য ক্রিয়া to be. এ কথায় অবশ্য তাঁরা আপত্তি করবেন, যাঁদের বিশ্বাস মানব-প্রকৃতির মূল ধাতু হচ্ছে to have,—কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, জীবনে কিছু পেতে হ'লে তার আগে কিছু হ'তে হয়। এক সভ্যতার সঙ্গে আর-এক সভ্যতার গড়নের পার্থক্য ঘটে শুধু বাহ্যবস্তুর আনুকূল্যে এবং প্রতিকূলতায়। এ পার্থক্য প্রাচীনকালে যেমন স্থূল ছিল, বর্ত্তমানে তেমনি সূক্ষ্ম হয়ে আসছে ; তার প্রথম কারণ, একালে এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির দেশের ও সেই সঙ্গে দেহের এবং মনেরও ব্যবধান কমে আসছে। আর তার

দ্বিতীয় কারণ এই যে, বর্ত্তমানে মানুষ বস্তুজগতের ততটা অধীন নয়, বস্তুজগত মানুষের যতটা অধীন। জাতিতে জাতিতে মনের ও ব্যবহারের পার্থক্য কমে আসছে বলে' এ ভয় পাবার দরকার নেই যে, মানবজীবন বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে পড়বে। জাতিতে জাতিতে প্রভেদ যেমন কমে আসছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ তেমনি বেড়ে চলেছে,—এক কথায় বিশিষ্টতা এখন জাতিকে ত্যাগ করে ব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতের মানব-সভ্যতা এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুণে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য লাভ করবে এবং এই বিচিত্রতাই হবে তার বিশিষ্টতা। অন্ততঃ আমাদের সভ্যতার জন্যে সে ভাবনা নেই। ভারতবর্ষ যদি একদেশ হিসেবে ধরা যায়, তাহ'লে সে দেশের সভ্যতা যুগপৎ হরবোলা ও বহুরূপী হ'তে বাধ্য।

ভবিষ্যতে যা হবার সম্ভাবনা, তা নাও হতে পারে; কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে, তা যে হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই। এবং প্রতি প্রাচীন সভ্যতার যে একটা বিশেষ রূপ ও বিশেষ ধর্ম্ম তাছে, সে কথাও অস্বীকার করা অসম্ভব। অথচ এ সকল সভ্যতার সামাজিক ব্যবহার এবং মনোভাবের মিলও বড় কম নয়। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে গ্রীক রোমান এবং হিন্দু সভ্যতার ভিতর ঠিক ততখানি মিল আছে, গ্রীক ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষার ভিতর যতখানি মিল আছে; এবং সে মিল প্রথমতঃ কম নয়, দ্বিতীয়তঃ তা ধাতুগত। যদিচ আমি পণ্ডিত নই, তবুও এ মত গ্রাহ্য করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই। তার কারণ, আমার বিশ্বাস সকল সভ্যতারই ধাতু এক, প্রত্যয় শুধু আলাদা। সে যাই হোক, যে-ক'টি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, সে সবগুলিই আমার মনে হয় এক-জাতীয়, অর্থাৎ আমার কাছে তার প্রতিটি হচ্ছে এক একখানি কাব্য।

কাব্যে কাব্যে যে প্রভেদ থাকে, এদের পরস্পরের ভিতর সেই প্রভেদ মাত্র আছে। আমার মতে গ্রীক সভ্যতা হচ্ছে নাটক, রোমান সভ্যতা মহাকাব্য, ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্ব্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট। আর ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে রূপকথা। সভ্যতার সঙ্গে কাব্যের তুলনা দেওয়ায় যদি কেউ আপত্তি করেন, তাহ'লে বলি, ও-তুলনা একটা খামখেয়ালির ব্যাপার নয়। আমরা প্রাচীন সভ্যতার যে সব মূর্ত্তি গড়ি, হয় পূজা করবার জন্য, নয় মনের ঘর সাজাবার জন্য,—অতীত শুধু তার উপাদান যোগায়, তাও আবার অতি স্বল্পমাত্রায়: সেই উপাদানকে আমাদের কল্পনাশক্তি গড়ন ও রূপ দেয়, এবং সেই রূপকে আমরা আমাদের হৃদয়-রাগে রঞ্জিত করি। কাব্যরচনার পদ্ধতিও ঐ।

সত্যকথা এই যে, সভ্যতা হচ্ছে একটা আর্ট এবং সম্ভবতঃ সব চাইতে বড় আর্ট; কেননা এ হচ্ছে জীবনকে স্বরূপ করে' তোলবার আর্ট, আর বাদবাকী যত-কিছু শিল্পকলা আছে, সে সবই এই মহা আর্ট হতে উদ্ভূত এবং তার কর্ত্তৃকই পরিপুষ্ট।

এ কথা অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা এবং দার্শনিকেরা মানবেন না; কেননা বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস, সভ্যতা জন্মে মাটির গুণে; আর দার্শনিকের বিশ্বাস, ও-বস্তু পড়ে আকাশ থেকে। এঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাব্যের জন্মদাতা যেমন কবি, সভ্যতার জন্মদাতাও তেমনি মানুষ। এ বস্তুর তত্ত্ব বিজ্ঞান দর্শন কখনও আবিষ্কার করতে পারবে না, কেননা ও-হচ্ছে জীবনের একটি postulate, জ্ঞানের axiom নয়;—অর্থাৎ মানুষের মন ছাড়া সভ্যতার অস্তিত্ব আর কোথাও নেই।

সে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সভ্যতার বিশিষ্টতা প্রমাণ করবার

কোনই প্রয়োজন নেই। William Archer প্রভৃতি সে বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ মানেন ; আমাদের উপর তাঁদের রাগ এই যে, আমরা আমাদের প্রাচীনতা ত্যাগ করে নবীন হবার চেষ্টা করছি। ফলে আমাদের সমাজ এখন হয়েছে প্রবীণ-নবীন ওরফে সভ্যাসভ্য। East এবং West যে ভারতবর্ষে meet করেছে, এই হচ্ছে আমাদের অপরাধ ; কেননা এই মিলনের ফলে কতকগুলি দুরন্ত সমস্যা জন্মলাভ করেছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী কি আমরা ?

পূর্ব্বাপর সভ্যতার এই মিলন ও মিশ্রণ যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয়, তার প্রমাণ ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতাও ত প্রবীণ-নবীন, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যার নাম দিয়েছেন antico-modern. বর্ত্তমান ইউরোপীয়েরা যে-অংশে ও যে-পরিমাণে জ্ঞানে গ্রীক, কর্ম্মে রোমান ও ভক্তিতে ইহুদি, সেই অংশে ও সেই পরিমাণে তারা সভ্য, এবং বাদবাকী অংশে তারা হচ্ছে শুধু সাদা মানুষ।

যদি বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা antico-modern হ'তে পারে, ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সভ্যতা কেন যে antico-modern হ'তে পারবে না, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে এ ক্ষেত্রে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটু প্রভেদ আছে। ইউরোপ তার নবীন সভ্যতার গায়ে প্রাচীন সভ্যতার কলম বসিয়েছে, অপর পক্ষে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন সভ্যতার গায়ে নবীন সভ্যতার কলম বসাচ্ছে। ফল কোন্‌টায় ভাল ফলবে, সে কথা বলতে পারে শুধু বৃক্ষায়ুর্ব্বেদীরা। তবে সহজ বুদ্ধিতে ত মনে হয় যে, নূতনের ঘাড়ে পুরাতনকে ভর করতে দেওয়ার চাইতে, নূতনকে পুরাতনের কোলে স্থান দেওয়াই বেশি স্বাভাবিক।

সুতরাং আমরা সভ্য কি অসভ্য, সে বিষয়ে আমাদের মাথা বকাবার দরকার নেই, কেননা এখন আমাদের মীমাংসা করতে হবে অন্য সমস্যার। প্রথমে যে-ক'টি সমস্যার উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে যে তিনটি বিল আকার ধারণ করেছে তাদের সম্বন্ধেও বেশি কিছু ভাববার নেই, কেননা এ কথা নিশ্চিত যে, রাউলাট-বিল পাস হবে, প্যাটেল-বিল হবে না, এবং রিফর্ম্-বিল পাশ হবে ও হবে না। যে দু'টি বাকি থাক্ল, শিক্ষা ও শিল্প, সে দু'টিই হচ্ছে এ যুগের আসল সমস্যা ; কারণ এ দু'টির মীমাংসার ভার অনেকটা আমাদের হাতে, এবং এ দু'টির আমরা যদি সুমীমাংসা করতে পারি, তাহ'লে আমরা সভ্য কি না, সে প্রশ্ন আর উঠবে না।

ফাল্গুন, ১৩২৫।

গোল টেবিলের বৈঠক

১

গোল টেবিলের নাম সকলেই শুনেছেন, এবং আমার বিশ্বাস, কেউ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ন'ন। কেউ কেউ হয়ত মনে করেছেন যে, ব্যাপারটা "এত্তো বড়," আবার কেউ কেউ হয়ত মনে করেছেন যে, ব্যাপারটা কিচ্ছুই নয়। তবে এ কথা ভরসা ক'রে বলা যায় যে, যাঁরা এ টেবিলের উপরে বিশেষ ভরসা রাখেন, তাঁদের মনেও এ ভয় আছে যে, শেষটা হয়ত দেখা যাবে, তাঁদের আশানুরূপ ফল ফল্‌ল না ; অপর পক্ষে যাঁরা কোনরূপ ভরসা রাখেন না, তাঁদেরও বিশ্বাস আছে যে, আমাদের

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের রূপ উক্ত টেবিলে কুছ-নেহি-ত থোড়া-থোড়া বদ্‌লাবেই।

এই গোল টেবিলের আলোচনার ফলে ভারত গভর্ণমেণ্টের রূপান্তর ঘটবেই; তবে সে নূতন রূপ আমাদের মনঃপূত হবে কি না, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে, বিলেতে আজ যে নাটকের অভিনয় হচ্ছে, সেটি একটি প্রহসন মাত্র, তাহ'লে তাঁর ধারণা যে অমূলক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, এ সভা যদি ফাঁকি হয়, তাহ'লে ব্যাপারটা প্রহসন না হয়ে হবে একটি ট্রাজেডি,—উভয় দলের পক্ষেই। বিলাতের রাজপুরুষরা এতদূর কাণ্ডজ্ঞানহীন নন যে, এই সোজা কথাটা তাঁরা বুঝতে পারেন না। বিলাত দেশটা আর যাই হোক, রঙ্গপুর নয়—অর্থাৎ হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রীর দেশ নয়। তবে এই সব বলা-কওয়া তর্ক-বিতর্কের ফলে ভারতবাসীরা নিজের দেশের রাষ্ট্রীয় ঘরকর্‌না চালাবার কতটা অধিকার পাবে, তা বলা অসম্ভব। আজকের দিনে ভারতবর্ষ কি চায়, সেইটেই হচ্ছে প্রধান কথা—ইংলণ্ড কি দিতে প্রস্তুত, সেটা প্রধান কথা নয়; কারণ তা অনুমান করবার কোন উপায় নেই। কেননা, ইংলণ্ডের রাজপুরুষদের কথা স্পষ্ট নয়। ভারতবর্ষের উক্তি যদি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়, তা হ'লে ইংলণ্ডের জবাবও ক্রমে স্পষ্ট হতে বাধ্য হবে। দু পক্ষই হাঁ-না হাঁ-না করলে আইনে যাকে বলে ইষুধার্য্য, তা হবে না। আর এ রাষ্ট্রীয় মামলায় উভয় পক্ষের মধ্যে আর কিছু না হোক, ইষুধার্য্য হবেই।

২

এ দেশ থেকে যাঁরা দেশের লোকের মুখপাত্রস্বরূপে গোল টেবিলে আসন গ্রহণ করতে বিলেতে গিয়েছেন, অথবা যাঁদের সেখানে চালান

দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মুখের কথা দেশের লোকের বুকের কথা হবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ ছিল। কারণ এই তথাকথিত প্রতিনিধির দলকে আমরা elect করিনি, সরকার বাহাদুর select করেছেন। বলা বাহুল্য যে, এ মামলায় উকীল নির্ব্বাচনের ভার যদি দেশের লোকের হাতে থাক্‌ত, তাহ'লে এঁদের অনেককেই আর কষ্ট ক'রে সমুদ্রলঙ্ঘন করতে হত না। এঁদের প্রতি সরকার যে অনুকূল, তার প্রমাণ পূর্ব্বেও পাওয়া গেছে। সুতরাং এঁরা যে দেশের হয়ে এই রাষ্ট্রীয় মামলা তেড়ে লড়বেন, অর্থাৎ ষোল-আনা দাবী করবেন, এ ভরসা দেশের লোকের ছিল না। তারপর আর এক দল আছেন, মুসলমান উকীল, যাঁরা মনে করেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী। তারপর আছেন ভারতবর্ষের অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজারাজড়ার দল। এই রাজারাজড়াদের মনের কথা, আমাদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অবিদিত। ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ে যাঁদের পূর্ব্বপুরুষরা এককালে খেলা করেছেন, তাঁদের বংশধররা যে ক্রিকেট ও পোলো ব্যতীত আর কোনও খেলা খেলতে পারেন, এ ধারণা আমাদের ছিল না। সুতরাং এই তিন দলে যে গলা মিলিয়ে একই সুরে একই কথা বলবেন, এ আশা কেউ করেনি—অন্ততঃ আমি ত করিনি। কিন্তু আমাদের পরস্পরের শিক্ষা-দীক্ষা, অবস্থা ও ধর্ম্মের বৈষম্য সত্ত্বেও সকলেরই যে মনের কথা মূলতঃ এক, তার প্রমাণ—সকলেই সমস্বরে বলেছেন, ভারতবর্ষ আর পরবশ থাক্‌তে চায় না, আত্মবশ হতে চায়; অর্থাৎ সকলেই চায় স্বরাজ। এ কথা পূর্ব্বে অনেকে মুখ ফুটে না বললেও যে সকলেরই চিরকেলে মনের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজ যে তাঁরা মুখ

ফুটে বলছেন, তার কারণ তাঁদের পিছনে আছে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রবল ইচ্ছাশক্তি। লোকমতকে উপেক্ষা ক'রে স্বমত প্রকাশ করতে আজকের দিনে কেউই সাহসী নন।

মানুষের মনোভাব ততক্ষণ অস্পষ্ট থাকে, যতক্ষণ না তা একটি কথায় সাকার হয়, সংক্ষেপে তার নামকরণ হয়। আমাদের পলিটিক্যাল সমাজে এই আত্মবশ হবার আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বপ্রথম নামকরণ করেন দাদাভাই নওরোজি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসে নওরোজি মহোদয় বলেন যে, দেশের লোক যা চায়, সে হচ্ছে স্বরাজ। বাঙলা দেশের যে স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতবাসীর মনকে নাড়া দেয় ও ঝাঁকিয়ে তোলে, তার থেকেই এই স্বরাজ কথা জন্মগ্রহণ করে। তার পূর্ব্বে এ কথা যে কেউ শোনে নি, তা নয়। তবে কংগ্রেসের কাছে এই তারিখেই তা প্রথম গ্রাহ্য হয়। দাদাভাই বলেন যে, ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির গভর্ণমেণ্ট যেমন তদ্দেশবাসীদের করায়ত্ত, ভারতবাসীরাও তদ্রূপ এদেশের গভর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করতে চায়। অর্থাৎ Dominion status হচ্ছে ভারতবাসীদের কাম্য, এবং তারা যতদিন তা লাভ না করে, ততদিন অশান্তিতে থাকবে। এই স্বরাজ শব্দ Dominion statusএর বাঙলা তরজমা, কিংবা Dominion status স্বরাজ শব্দের ইংরাজী তরজমা, তা বলতে পারিনে। তবে বহু লোকের কাছে যে স্বরাজ Dominion statusএর প্রতিশব্দ ব'লে গ্রাহ্য হয়েছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই বলছি এই কারণে যে, লোক যে উপায় অবলম্বন করে, তার থেকেই তাদের উদ্দেশ্য ধরা পড়ে, মুখের কথায় নয়। তবে বহু লোকের পক্ষে কোন বিষয়ে একমত হ'তে হ'লে যে একটি

কথার সাহায্য চাই, তা ধর্ম্ম সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এই গোল টেবিলের বৈঠকে সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীরা যে একবাক্যে Dominion statusএর দাবী করেছেন, এইটেই প্রমাণ যে, অন্ততঃ এ বিষয়ে সকল সম্প্রদায়ের মতের ঐক্য আছে। যেখানে মানুষের মনের ঐক্য কাছে, সেখানে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পার্থক্য টেঁকসই নয়।

৪

মনোভাব যেমন নামের অপেক্ষা রাখে, নামও তেমনই রূপের অপেক্ষা রাখে। নাম ততক্ষণ শুধু কথার কথা থেকে যায়, যতক্ষণ না তা একটি বিশেষ রূপের ভিতর আবদ্ধ হয়। যা কিছু বাস্তব, তারই যে নামরূপ আছে, এ সত্য ত হিন্দুমাত্রেই জানেন।

ভারতবাসীদের সর্ব্বজনকাম্য স্বরাজ কি রূপ ধারণ করবে, তাই এখন হয়েছে গোল টেবিলের বৈঠকের সমস্যা। আজকে এদেশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যে মূর্ত্তি আছে, তারই এক-আধটু বদলসদল ক'রে আমরা তার যে রূপই খাড়া করিনে কেন, তাতে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বরাজ-রূপের দর্শন পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষের তিন ভাগের এক ভাগ সে স্বরাজের বাইরে প'ড়ে থাক্‌বে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ম্যাপে যে অংশ এখনও টক্‌-টকে লাল রঙে ছোপানো হয় নি, সেই অ-বৃটিশ ভারতবর্ষ এখন যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই থেকে যাবে—বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে। এই অর্দ্ধস্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের মনের যোগও একরকম ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইংরাজীতে যাকে বলে Native States, সত্য কথা বল্‌তে হলে

আমরাও তাদের Natives মনে করি। যদিও এই সব অর্দ্ধ-স্বরাট দেশ ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিরও বহির্ভূত নয়, হিষ্টরিরও বহির্ভূত নয়। এদের বাদ দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বরাজ গঠন কারও idealও হতে পারে না, realও হবে না। ইতিপূর্ব্বে আমরা কাগজ-কলমে যে স্বরাজের নক্সা এঁকেছি, তাতে Native Statesএর কোনও স্থান নেই শুধু তাই নয়, বৃটিশ-ভারতবর্ষের সঙ্গে অ-বৃটিশ ভারতবর্ষের কি সম্বন্ধ হবে, তাও আমরা স্পষ্ট ক'রে ভাবতে পারিনি। এ দুই ভারতবর্ষের মিলনের কথাটা হয় উহ্য রয়ে গেছে, নয় গোঁজামিল দিয়ে সারা হয়েছে।

৫

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রটার রূপ যে কি, তা এখন দেখা যাক্। গোল টেবিলের বৈঠকের জনৈক প্রধান ব্যক্তি, যিনি এ যন্ত্র ভেঙ্গে নূতন যন্ত্র গড়বার হদিস্ বাৎলাচ্ছেন, তাঁর মুখেই শোনা যাক্ এ যন্ত্র কোন্ শ্রেণীর। Lord Sankey বলেছেন যে ঃ—

"British India at present is a "Unitary State," divided for convenience into provinces, and is not a number of provinces federated to form a State.

There was hardly any organic connexion between the provinces. There was no organic connexion between the States, or any one of them and British India."—Statesman, Nov. 30.

অর্থাৎ বৃটিশ ভারতবর্ষের এক প্রদেশের সঙ্গে অপর প্রদেশের কোনরূপ

যোগ নেই; তাদের এইমাত্র যোগ আছে যে, সব প্রদেশই এক শাসনাধীন। অর্থাৎ বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ বা কোন জাতিরই রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই, সবাই অধীন, সবাই অপ্রধান। উপরন্তু Native Stateগুলিরও পরস্পরের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই, এবং তারা বৃটিশ ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। বৃটিশ-রাজ আজ যে সব প্রদেশ গড়েছেন, সে একমাত্র শাসনের সুবিধার জন্য। আর যদি দরকার মনে করেন, তাহ'লে কালই একটা Province ভেঙ্গে দুটো প্রদেশ করতে পারেন, যেমন বঙ্গভঙ্গের সময় করেছিলেন; অথবা দুটোকে জুড়ে একটা করতে পারেন, যেমন বিহার ও উড়িষ্যাতে করেছেন। এ যোগ প্রাণের যোগ নয়, শাসনের। প্রাণীর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যোগ প্রাণের যোগ, কিন্তু জড়পদার্থকে আমরা ইচ্ছামত যুক্ত ও বিযুক্ত করতে পারি। বৃটিশ ভারতবর্ষের ঐক্য এই জড়পদার্থের যোগফল। যতদিন আমরা উপরের চাপের বশীভূত থাকব, ততদিন এ ঐক্য থাকবে; আমাদের প্রাণের স্ফূর্তির উদ্রেকে এ যোগ নষ্ট হবে।

৬

প্রথমতঃ এ শাসনযন্ত্রটা Unitary, তারপর য়ুনিয়নও যোড়াতাড়া দিয়ে গড়া হয়েছে। এ যন্ত্রটাকে মেরামত ক'রে কোনও নূতন যন্ত্রে পরিণত করা অসম্ভব। Sir John Simon এ যন্ত্রটার গড়নের বিষয়ে কি মতামত প্রকাশ করেছেন, তা শোনা যাক্ঃ—

The Government of India Act was one of the most complicated instruments ever devised. He asked how

many people outside experts and specialists were really prepared to give a reasonably full and accurate account of its contents.—Statesman, Nov, 30.

এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনে। কারণ, আমি এ বিষয়ে expert নই, specialistও নই। সে কারণ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, ব্যাপারটা একটা বিশ্রী খিচুড়ি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই হ য ব র ল'কে উল্টোপাল্টা ক'রে সাজাবার প্রস্তাবই এ যাবৎ হয়েছে। ফলে যা আগাগোড়া জটিল, তাকে কেউ সরল করতে কৃতকার্য্য হন নি। যন্ত্র যেমন আছে তেমনি রেখে, শুধু বিলেতী যন্ত্রীর পরিবর্ত্তে দেশী যন্ত্রীর হাতে এ কল চালাবার ভার যাঁরা দিতে চেয়েছিলেন, তাঁরা এ কথাটা লক্ষ্য করেন নি যে, বিরাজ্যেই এ যন্ত্র চলে, স্বরাজ্যে একেবারে অচল হয়ে পড়ে। সুতরাং স্বরাজ্যের শাসনযন্ত্র অন্য নমুনায় গড়্তে হবে। ভারতবর্ষের প্রতি দেশ প্রতি জাতি যাতে ক'রে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেই ব্যবস্থাই আমাদের করতে হবে। সে আদর্শ হচ্ছে United States of India.

৭

যে পদ্ধতি অনুসারে United States of Americaর রাষ্ট্রতন্ত্র গড়া হয়েছে, তারই নাম Federal Government; এবং আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে এ তন্ত্রের আদি ও সর্ব্বপ্রধান নমুনা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর যে-সকল দেশের Dominion Status আছে, যথা ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি, সবই উক্ত আদর্শে গড়া হয়েছে, সবই

Federal Statesএর সমষ্টিমাত্র। এক কথায়, ও-সব দেশের প্রতি প্রদেশ তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে এক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কতকগুলি বিষয়ে প্রতি প্রদেশ স্বরাট, আর অপর কতকগুলি বিষয়ে রাজকার্য্য চালাবার ভার সকল প্রদেশের মিলিত প্রতিনিধি-সভার উপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রতি প্রদেশের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা আছে, স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা আছে, যাদের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করবার Central Government-এর বিশেষ কোনও অধিকার নেই। সকল প্রদেশই স্বতন্ত্র ও স্বরাট, অথচ পরস্পর যুক্ত হয়ে এক দেশ হয়েছে। যাকে বলে Unitary গভর্ণমেণ্ট, তা' কেবল ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেশের পক্ষেই সম্ভব; আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যে-সকল দেশে Unitary গভর্ণমেণ্ট আছে, সে-সকল দেশও আজ decentralisationএর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে। এক রাজা অথবা এক পার্লামেণ্টের অধীন থাকা য়ুরোপের কোন দেশই আজকের দিনে শ্রেয়স্কর মনে করে না। একমাত্র রাষ্ট্রের ঐক্যের খাতিরে এ যুগের য়ুরোপের লোকেরা অন্যান্য বিষয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বলিদান দিতে প্রস্তুত নয়। কেননা তাদের ধারণা যে, লোকসমাজ যখন federal, তখন রাষ্ট্রতন্ত্র federal হওয়া উচিত; অন্যথা মানুষের বিশেষত্ব পূর্ণবিকশিত হবার সুযোগ পায় না, উপরের চাপে দ'মে যায়। এই Federal Governmentএর প্রসাদে বহু লোক আংশিকভাবে রাজ্যশাসনের ভার নিজেদের হাতে পায়। যে মনোভাবের উপর democracy প্রতিষ্ঠিত, সেই মনোভাবই বিশ্ব-মানবকে Federal Governmentএর দিকে অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে।

৮

অপর দেশের কথা যাই হোক্, স্বরাট ভারতবর্ষের পক্ষে একমাত্র Federal Governmentই স্বাভাবিক এবং সম্ভব। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ, দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীরা অসংখ্য বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং প্রদেশভেদে প্রতি জাতির ইতিহাস বিভিন্ন, চরিত্র বিভিন্ন, মনের গঠন ও গতি বিভিন্ন। এই বিরাট দেশ ও বিচিত্র মানবসংঘকে এক শাসনযন্ত্রে পিষে এক জাতিতে পরিণত করা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। পরবশ ভারতবর্ষ আপাতদৃষ্টিতে ও-ভাবে একাকার হতে পারে, কিন্তু আত্মবশ ভারতবর্ষ হতে পারে না। সমগ্র ভারতবাসীর মত ও চরিত্র এক ছাঁচে ঢালাই করা তেমনি সম্ভব, তাদের মুখের ভাষা এক ভাষা করা যেমন সম্ভব। সমগ্র ভারতবর্ষের এক ভাষা হতে পারে শুধু সরকারী ভাষা— তাও যদি আবার হয় বিদেশী ভাষা। ও-জাতীয় ভাষা মানুষের অন্তরের ভাষা নয়, সরকারের দপ্তরের ভাষা। ভারতবর্ষ চিরকালই নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ খণ্ডরাজ্যগুলিকে এক সূত্রে গাঁথার উপায় হচ্ছে Federal Government। এ স্বরাজ-মালা গাঁথা অবশ্য সহজ নয়।

প্রথমতঃ, যুক্ত ভারতবর্ষের Central Governmentএর হাতে কোন্ কোন্ অধিকার থাক্‌বে, ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির হাতে কোন্ কোন্ অধিকার থাক্‌বে, তা স্থির করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, Central Governmentএর সঙ্গে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কি সম্বন্ধ থাক্‌বে, তাও স্থির করতে হবে। যাঁদের মনে বর্ত্তমান Unitary Governmentএর

জলুসের ধাঁধা লেগেছে, তাঁরা অবশ্য Central Governmentকে প্রবল প্রতাপান্বিত করতে চাইবেন; অপরপক্ষে যাঁরা Federal গভর্ণমেণ্টের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁরা অবশ্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-গুলির উপর উপরের চাপ যতদূর সম্ভব হাল্‌কা করতে চেষ্টা করবেন। ফলে এই কল্পিত নব শাসনযন্ত্র যে কাগজেকলমে কি মূর্ত্তি ধারণ করবে, তা বলা অসম্ভব। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকার স্বরাজের মূর্ত্তি এক ছাঁচে ঢালাই হয়নি। অথচ এ সকল দেশই স্বরাট, যদিচ এর কোন দেশই নিখুঁৎ Federal Government গড়ে তুলতে পারে নি, এবং তাদের সমাজযন্ত্রের সকল অংশ খাপে খাপে মিলে যায়নি। এ রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাসভায় কথা কইবার অধিকারে আমি যখন বঞ্চিত, তখন এ খেলা যাঁরা খেলছেন, তাঁদের কাছে উপর-চাল দেওয়া বৃথা। সুতরাং তাঁরা পাঁচ হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষের কি স্বরাজমূর্ত্তি গ'ড়ে তোলেন, তা পরে দেখা যাবে। শেষটা হয়ত দেখব যে, এ নব শাসনযন্ত্র নামে হবে federal, কাজে হবে monarchical। মানুষে যে শিব গড়তে ব'সে কখনো কখনো বানর গড়ে, তা সকলেই জানেন।

৯

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, এ ব্যাপারে যে পক্ষ প্রবলপক্ষ, অর্থাৎ বৃটিশরাজ, তাঁরা যে দেশের লোকের দাবী কতটা মঞ্জুর করবেন, তা বলা অসম্ভব। কারণ, এ বিষয়ে কোনরূপ অনুমান করবার উপায় নেই। সাধারণভাবে এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসীর দাবী ষোল-

আনা মঞ্জুর হবে না, বড় জোর আমাদের ভাগ্যে মিলবে, আধা-ডিক্রী আধা-ডিস্‌মিস্।

কিন্তু আজকের দিনে যেটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বস্তু, সে হচ্ছে ভারতবাসীর দাবী। এখন এই বৈঠকের নানারূপ কথাবার্ত্তার ভিতর একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সে কথাটি এই যে, সমগ্র ভারতবাসী আজ যা চায়, তা হচ্ছে স্বরাজ, আর সে স্বরাজের নাম Dominion Status এবং রূপ Federal Government। আর এ দাবী করেছেন সেই শ্রেণীর লোক, যাঁরা বৃটিশ-রাজের কাছে বেশী কিছু চান না, আর ছুয়ে ছুয়ে তিন করাই যাঁরা বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করেন; এবং রাজ-পুরুষরাও যাঁদের কস্মিন্‌কালেও impatient idealist ব'লে ভুল করেন-নি, বরং patient realist বলেই গণ্য ও মান্য করেছেন।

তার উপর অ-বৃটিশ ভারতবর্ষও বৃটিশ ভারতবর্ষের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ জিওগ্রাফির হিসেব থেকে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন এক-তৃতীয়াংশ বাকী অংশের সঙ্গে মিলিত হতে রাজী হয়েছে,—অবশ্য বৃটিশ ভারতবর্ষ যদি স্বরাজ লাভ করে। অপর পক্ষে বৃটিশ ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীরা, অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যুরোক্রাশি-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা, বাকী ভারতবাসীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক হবার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ জিওগ্রাফি হিসেবে গোটা ভারতের ঐক্য-সাধন হোক, কিন্তু মানুষ হিসেবে তার এক-তৃতীয়াংশ বাকী অধি-বাসীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক হোক—এই হচ্ছে তাদের দাবী। বর্ত্তমানের বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে একটি মহা সমাসে পরিণত করবার উক্ত সম্প্রদায়ও পক্ষপাতী, শুধু তাঁরা সে সমাসকে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব-সমাস

ফেরতে চান। আমাদের স্বরাজের সাধের তরণী যদি এই বিচ্ছেদ অঙ্গীকার ক'রে কালের অকূল সাগরে ভাসানো যায়, তাহ'লে তার ফল যে কি হবে তা সকলেই জানেন।

১০

ভারতবর্ষের নানা ভূভাগের নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যে আমাদের ideal সম্বন্ধে একমত হয়েছেন এবং সে মত স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেছেন, এর কারণ, এ দাবীর পিছনে লোকমতের প্রচণ্ড ঠেলা আছে। এ বৈঠকের ফলে আর কিছু হোক না হোক, এইটুকু হয়েছে যে, বর্ত্তমান ভারত যে অবিলম্বে আত্মবশ হতে চায়, সে বিষয়ে বৃটিশরাজের কোনরূপ সন্দেহের আর অবসর নেই। এ দাবী ছোট ছেলের আবদার নয়, যা ভোগা দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া যায়।

এর পর ভারতবর্ষ যদি স্বরাজ লাভ না করে, এ দেশের বর্ত্তমান অশান্তি উত্তরোত্তর ঘোরতর অশান্তিতে পরিণত হবে। মানুষের মনের গতির সঙ্গে জীবনযাত্রা যদি পৃথক হয়ে পড়ে, তাহ'লে এই মন ও জীবনের অসামঞ্জস্যটা তার জীবন-মনকে একসঙ্গে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির ক'রে তোলে।

অপরপক্ষে ভারতবর্ষ কাল যদি স্বরাজ লাভ করে, তাহ'লে পরশুই যে আমরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করতে আরম্ভ করব, অর্থাৎ স্বরাজ হারাতে বসব, তার কোনও সম্ভাবনা নেই। এ দেশের লোক প্রধানতঃ সভ্যতার পোষমানা জীব, হিংস্র জন্তু নয়। পরস্পর পরস্পরের

প্রতি প্রভুত্বের [illegible] বেশি স্বাভাবিক।

আর এক কথা, এই নূতন স্বরাজ যে কেউ আমাদের গালে চড় মেরে কেড়ে নেবে, সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। গোটা ভারতবর্ষ কেউ কখন বাহুবলে করায়ত্ত করতে পারেনি। পুরাকালে নানা প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা যখন পরস্পর দাঙ্গাহাঙ্গামা ক'রে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই যে স্বদেশী বা বিদেশী রাজা এই ভাঙা ভারতবর্ষকে আঠা দিয়ে জুড়তে পেরেছেন, তিনিই ভারতবর্ষের একেশ্বর হয়েছেন। অপরপক্ষে এই নব স্বরাজ্য হবে গোটা ভারতবর্ষের যুক্ত স্বরাজ্য, এবং তা প্রতিষ্ঠিত হবে, অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বালখিল্য রাজশক্তির উপর নয়, সমগ্র ভারতের মিলিত প্রজাশক্তির উপর।

সে যাই হোক, ভারতের পূর্ণ-স্বরাজের দর্শন যে আমাদের ভাগ্যে মিলবে, তার সম্ভাবনা নেই; তবে আমাদের ছেলেরা যে তা হাতে পাবে, এ আশা করার বৈধ কারণ আছে। অবশ্য সে স্বরাজ আকাশ থেকে পড়বে না, নীচে থেকেই গড়ে তুলতে হবে; এবং তার জন্য চাই জ্ঞান কর্মের ঐকান্তিক চর্চা। ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি গড়েছে প্রকৃতি, কিন্তু ভারতের হিস্টরি গড়েছে, গড়ছে ও গড়বে—পুরুষ। আর এই কথাটি সকলে মনে রাখ্‌বেন যে, স্বরাজ নব ভারতের চরম কথা নয়, প্রথম কথা; আমাদের জাতীয় আত্মোন্নতির চূড়া নয়—ভিত্তি মাত্র।

পৌষ, ১৩৩৭।